বিশ্বজাগতিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ইলমুল কালাম

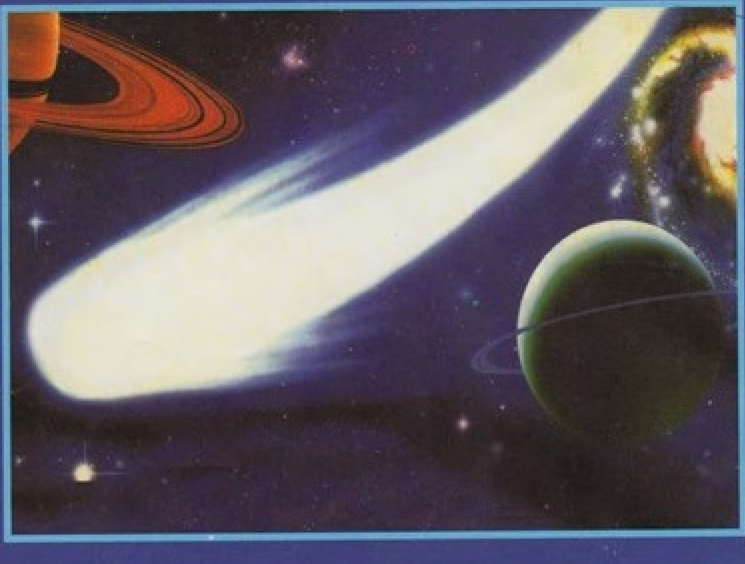

আলী মনসুর

বিশ্বজাগতিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব
ও
ইলমুল কালাম

আলী মনসুর

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

বিশ্বজাগতিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ইলমুল কালাম
আলী মনসুর

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রোপ্রাইটর
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়
আহ্‌সান পাবলিকেশন
ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
মে, ২০০৯
জমাদিউস সানী, ১৪৩০
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও ছাপা
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

বিনিময় : নব্বই টাকা মাত্র

Bisha Jagatik Boigganik Tatta O Ilmul Kalam (Universal Scientific Theory & Quranic Knowledge) written by Ali Mansur Published by Muhammad Golam Kibria Proprietor RAQS Publications 230 New Elephent Road, Dhaka-1205, First Edition May, 2009 Price Tk. 90.00 only.

RAQS Publications series : 13

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
রাব্বুল আলামিন (বিশ্ব প্রতিপালক) ১১
জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি ৩০
আল্লাহর নূর ঃ ফোটন-ইলেকট্রন-প্রোটন (পদার্থ) ৪৪
মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্নসীমা ৫৮
সপ্তাকাশ এবং তার সংরক্ষণ ৭২
ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি ও বিজ্ঞানীদের উভয় সংকট ৮৪
বিজ্ঞানের প্রতীমা পূজা ৯২
আল্লাহর আরশ এবং সিদরাতুল মুনতাহা ১০২
উপসংহার ১১৬

বিশ্বপ্রতিপালক ও পরম করুণাময়ের নামে শুরু করছি।

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় মানব প্রচেষ্টায় অর্জিত জ্ঞানের পাশাপাশি আরেক প্রকৃতির জ্ঞানের বাহক অবিরামভাবে কার্যকর ছিলো যাকে বলা হয় আসমানী কিতাব বা অবতীর্ণ গ্রন্থ। প্রথমটি হলো আরোহী জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হলো অবরোহী জ্ঞান। মানবীয় সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য এ দু'প্রকৃতির জ্ঞানের সমন্বয় সাধন অপরিহার্য। কিন্তু বিশ্বে প্রচলিত অনেক ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত অবতীর্ণ গ্রন্থ আর কোন্‌টি নয় তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আমরা তার বিস্তারিত বিবরণে যাবো না, কারণ সেটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং এ বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থের অভাব নেই। তবে ঐতিহাসিকভাবে আমরা দেখতে পাই, সব অবতীর্ণ গ্রন্থের লালন ভূমি হলো প্রাচ্য, ভৌগোলিকভাবে যার বিভাজন রেখা শুরু হয়েছে ভূমধ্যসাগরের পূর্বপাড় থেকে।

পাশ্চাত্য প্রাচীন গ্রীক-রোমান সভ্যতার সত্য অন্বেষণকারী জ্ঞানীগুণীগণ ধর্মগ্রন্থবিহীন ছিলেন বিধায় তাদের ছিলো আরোহী জ্ঞান এবং অবতীর্ণ গ্রন্থের জ্ঞানের সুযোগ তাদের ছিলো না। প্রাচ্য তথা উর্বর চন্দ্রিকাঞ্চল ঐতিহাসিক ভাবে ছিলো আরোহী জ্ঞান ও অবতীর্ণ গ্রন্থের জ্ঞানের ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষেত্র। কিন্তু এ ভারসাম্যতা বিপন্ন হয় গ্রীক-রোমান সভ্যতার পদচারণায় এবং তার ফলে এ অঞ্চলের ধর্মীয় জ্ঞানও কলুষিত হয়। এটার সঠিক উপমিত বর্ণনা হলো বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দানিয়েলের সপ্তম অধ্যায়।

এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার রাহুমুক্ত ও উর্বর চন্দ্রিকাঞ্চলের (Furtile cresent) পাদবিন্দু আরব ভূখণ্ডে বিশ্বের যাবতীয় অবতীর্ণ গ্রন্থের পরিপূর্ণ রূপ ও নির্যাস হিসেবে অবতীর্ণ হয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। ফলে এটা অবিকৃত ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে অক্ষুণ্ন থেকে যায়।

কিন্তু ইসলাম পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তার লাভের সাথে সাথে গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান, ভারতীয় বৈদিক ও বৌদ্ধ দর্শন, পারস্য-মিশরীয় ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মীয় মতবাদ আল-কুরআনের মূল আদর্শকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছিল এবং তার প্রেক্ষিতে ও প্রতিরোধে অভিনব এক জ্ঞানের ভিত্তি বিকশিত হয়, যার নাম ইলমুল কালাম বা কালাম দর্শন। প্রফেসর হ্যারি অষ্ট্রিন উল্ফসনের (Harry Austryn Wolfson)

মতে কালাম দর্শনের ভিত্তি হলো অবতীর্ণ গ্রন্থ বিশেষত আল-কুরআন, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তি হলো মানবীয় দূরকল্পন। ফলে কালাম দর্শন হলো মানবীয় অর্জিত জ্ঞান, বিজ্ঞানের চিন্তাধারাকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় বাণীর আলোকে শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা। ইসলামী কালাম দর্শনের প্রভাবে বিকশিত হয়েছিল ইহুদী কালাম দর্শন ও খ্রিস্টীয় কালাম দর্শন এবং এ দু'টো শাখা ইউরোপীয় সভ্যতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তার মতে কালাম দর্শনের বিস্তার হলো সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন এটা স্পিনোজার (Spinoza) প্রাকৃতিক দর্শনের প্রভাবে এবং দুর্বল ইহুদী-খ্রিস্টীয় কালাম দর্শনের ব্যর্থতার কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে স্থানচ্যুত হয়। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার চৈতন্যবোধে স্পিনোজা উত্তর চিন্তা চেতনায় নাস্তিকতার পথ উন্মুক্ত হয় যা বর্তমানে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনে স্থায়ী আসন পেতে বসেছে। স্পিনোজার দর্শনে বিশ্বাসী আইনস্টাইন ও নিল্স্ বোর আধুনিক বিজ্ঞানের দুই ভিন্নধর্মী তত্ত্ব- আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছেন। এ দু'টোই যৌক্তিকভাবে অসংগতিপূর্ণ। আমরা প্রকৃত কালাম দর্শনের কিছু দিক উজ্জীবিত করে দেখব বিশ্বের সার্বিক জ্ঞানের জন্য কিভাবে সঠিক পথ লাভ করা যেতে পারে। আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিপরীতে যারা চিরায়ত বিজ্ঞানে প্রত্যাবর্তন করতে চান আমরা দেখব সেই নিউটনীয় বিজ্ঞানেও বিভ্রান্তির জটিলতা মানব জ্ঞানকে কেমন ভৌতিক করে তুলেছে।

কেবল মানব প্রচেষ্টায় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দর্শন যে পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা যৌক্তিকভাবে প্রদর্শন করেছেন ইমাম গাযযালী তার তাহাফাতুল ফালাসিফাহ গ্রন্থে এবং এরপরই তিনি প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় রচনা করেছিলেন 'ইয়াহ-উলুম আদ-দীন'। কিন্তু বিগত প্রায় হাজার বছরে ধর্মীয় জ্ঞানের তেমন মৌলিক গবেষণা হয়নি। বলা চলে ইসলামী জ্ঞান স্থবির হয়েছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ড. মুহাম্মদ ইকবাল ইসলামী জ্ঞানের পুনর্গঠনের আহ্বান জানালেন তাঁর- The reconstruction of the religious thought of Islam গ্রন্থে। কিন্তু উপনিবেশীয় যুগে দুর্বল চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত ফিরে গেলেন জাভেদ-নামায় এবং ইসলামী প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধিতে ব্যর্থ হলেন এবং প্রকারান্তরে ইসলামী জ্ঞানকে অবমূল্যায়ন করলেন। বস্তুত পশ্চিমা দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি প্রাচ্যের অধিকাংশ শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণীদের মানসিক প্রবণতা হলো একনিষ্ঠ স্তুতিবাক্যের সমাহার। এসব স্তুতিবাক্যের সমাহারে জমা হয়ে আছে মিথ্যে তত্ত্বের পাহাড়। একটি দাঁড়ির মাথায় কতগুলো

ফেরেস্তা খেলা করতে পারে এবং একটি বাস্তব বিশ্বে কতগুলো সমান্তরাল কাল্পনিক বিশ্ব থাকতে পারে– এ দু'টো দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান হলো পরস্পর চৈতন্যবোধের পরিমাপক। প্রাচীন ধর্মীয় বর্ণনায় বলা হয়েছিল সুঁইয়ের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ সম্ভব হলেও অবিশ্বাসীদের স্বর্গে প্রবেশ অসম্ভব। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে শুধু উট কেন সমগ্র বিশ্বজগৎ সুঁইয়ের ছিদ্রপথে প্রবেশ সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা দাবী করছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবাস্তবতা ও বিশ্বাসহীন প্রজন্মের কল্পনাবিলাস এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এখন তারা তত্ত্ব-নির্দেশিকা লিখছেন কিভাবে গবেষণাগারে বিশ্ব তৈরী করা সম্ভব। ইমাম গাযযালী তার তাহাফুতুল ফালাসিফাহ গ্রন্থের মুখবন্ধে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের সম্বন্ধে যেসব অভিযোগ তুলেছিলেন তা বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সত্য এবং জ্ঞানের সব বাহন নাস্তিকতার দিকে পরিচালিত।

বর্তমান বিজ্ঞান বিশেষত: তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান যে স্ব-বিরোধী ও ভীষণ সংকটের মুখোমুখী (crisis in physics) তা অনেক বিজ্ঞানীও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এসব বলিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মাইল্স মাথিস (Miles Mathis) ও পল মারমেট (Paul Marmet) তাদের Greatest standing errors in physics and mathematics এবং Absurdities in modern science গ্রন্থে। হার্ভাড ডিঙ্গেল science at the cross-road গ্রন্থে বিজ্ঞান কিভাবে বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং এজন্য গাণিতিক দূরকল্পনের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারকে দায়ী করেছেন। গাণিতিক দূরকল্পনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দূরকল্পন এবং এটা হয়ে উঠেছে তাত্ত্বিক জ্ঞানের আধুনিক ভিত্তি। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পদার্থ বিজ্ঞানের উদ্ভট কিছু প্রহসনের উপর (Bryan G. Wallace : Force of Physics) এবং তার সাথে যোগ হয়েছে পর্যবেক্ষণগত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের আড়াল করার প্রবণতা (Suppression of inconvenient facts of physics)। ফলে হার্ভাড ডিঙ্গেলের তিন দশক পর আইভর ক্যাট (Ivor Catt) লিখেছেন Science beyond the cross-road এবং বিভাস দে বলছেন, অধিকাংশ বিজ্ঞানী এখন হোকাশ-পোকাশ ব্যক্তি (Mathematical transphysicists : The ultimate Hocus Pocus man – Bibhas De)।

অনেক প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য কাল্পনিক নাকি বাস্তব তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছে না। এসব সংকট থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টায় প্রফেসর কানারভ রচনা করেছেন প্রকৃত বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন (Resurrection of the exact science)।

বস্তুত প্রকৃত জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন, শুধু বিজ্ঞানের নয়। আধুনিকোত্তর বিজ্ঞানের (Post-modern science) তাত্ত্বিক কাঠামোকে অনেকে অভিহিত করেন বুদ্ধিবৃত্তির সৌখিন কাণ্ডজ্ঞানহীনতা (Intellectual fashionable nonsense) বলে এবং বিজ্ঞানের পরিচিতি হয়েছে অপবিজ্ঞান (pseu-science) হিসেবে। যে দার্শনিক তাত্ত্বিক দূরকল্পনের ভিত্তির উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাকে অবতীর্ণ গ্রন্থীয় বাণী দ্বারা শুদ্ধ না করলে বৈজ্ঞানিক সত্য নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রকৃত ও সর্বজনীন সত্য হিসেবে যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হলো বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের কোনো শাখা জ্ঞান নয়।

আমরা দর্শনের ও বিজ্ঞানের মৌলিক অসামঞ্জস্যতাগুলোর কিছু নির্দিষ্ট বিষয় বিশ্লেষণ করে বিভ্রান্তিজনক তাত্ত্বিক দিকগুলো ফুটিয়ে তুলব এবং দেখব এসব বিভ্রান্তি তথা ভৌতিক বৈশিষ্ট্য অপসারিত হলে বিজ্ঞান কিভাবে অবতীর্ণ গ্রন্থীয় বাণীর সাথে একাত্ম হয়ে যায়। সত্য কখনো বিপরীতমুখী হতে পারে না। যেসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমরা বিশ্বাস করি সঠিক পথেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং প্রকৃত সত্যের আভাস সুদীর্ঘ তমসার দিগন্তে সূর্যের উজ্জ্বল আলোর ন্যায় ফুটে উঠছে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তি হলো পদার্থের অস্তিত্ব ও তার সাথে বিভিন্ন প্রকার পদার্থিক শক্তির সম্পৃক্ততা। কিন্তু পদার্থের অস্তিত্ব লাভ ও অস্তিত্বশীলতা স্থান ব্যতিত অসম্ভব এবং পদার্থিক তত্ত্ব পদার্থপূর্ব ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে না। এটা হলো সমস্ত পদার্থিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা এবং তাই বিশ্বজাগতিকভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না। কার্ল প্রোপারের (Carl Proper) ভাষায় সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই মিথ্যে প্রতিপাদনযোগ্য এবং এটাই হলো বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। প্রকারান্তরে কোনো অধিবিদ্যাগত তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা মিথ্যে প্রতিপাদনযোগ্য নয়।

যারা বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে বিনা বিচারে পরম সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং নিজেদেরকে সত্যপূজারীর দাবী করছেন তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য মনে না হলেও তাদের জ্ঞানের ভিত্তিকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আমাদের কাছে আছে। তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল, তাদের জ্ঞানের ভিত্তি পুনরায় বিশ্লেষণ করে সত্যতা যাচাই করতে। বর্ণনার বিপুলতা আমরা পরিহার করে স্বল্প ভাষায় আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছি এবং কেউ আমাদের বক্তব্যকে যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করতে যথোপযুক্ত বক্তব্য পেশ করলে কেবল তখন আমরা দীর্ঘ পরিসরে আলোচনায় অগ্রসর হবো। আমরা একাডেমিক পরিমণ্ডলের মূল স্রোতধারার বাইরে থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায় যে

পথ পরিক্রমায় এগিয়ে চলছি ভবিষ্যতে সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি সহযাত্রী হিসেবে যোগ দেবেন বলে আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস। আমাদের বক্তব্য যাদের কাছে বোধগম্য হতে কঠিন মনে হয় তাদের জন্য অচিরেই আমরা এ গ্রন্থের পটভূমি হিসেবে আরেকটি গ্রন্থ উপস্থাপন করব।

অনেক বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞানীদের মতো প্রফেসর টি.জেড. কালানভ আক্ষেপ করেন সত্য না পাওয়ার যন্ত্রণায় এবং বলেন "Crisis in physics : Why truth is not granted to mankind" কিন্তু আমরা বলব, সত্য মানবজাতির চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে, তবু অধিকাংশ লোক তা গ্রহণে অস্বীকার করছে কিংবা গ্রহণ করার মতো চৈতন্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

মধ্যযুগের ইরানী এক কবির ভাষায় মহাবিশ্ব হলো একটি গ্রন্থস্বরূপ, যার প্রথম ও শেষ দিকের পাতাগুলো ছেঁড়া। কবি বিজ্ঞানী দার্শনিক গণিতবিদদের বক্তব্য শুরু হয় এর মধ্য থেকে এবং বক্তব্যের পশ্চাৎগামিতা ও অগ্রগামিতা হলো বিশ্বগ্রন্থের ছেঁড়া পাতাগুলো লিখে পূরণ করার প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টায় তারা খুঁজে পেয়েছেন ধারণাগত সংযোজনের মাধ্যমে অসীম পশ্চাৎগামিতা ও অসীম অগ্রগামিতা এবং কোথায় শুরু ও কোথায় শেষ হবে, তার দিক নির্দেশনা তাদের নেই।

প্রাচীনকাল থেকে প্রতীমা পূজা প্রসঙ্গে প্রচলিত আপ্তবাক্য যে" চল, আমরা নিজ হাতে দেবতা সৃষ্টি করে পূজা করি" এবং বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগে বলা হচ্ছে" চল, আমরা সে দেবতাদের নিজেদের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপন করে পূজা করি" এবং পুরোহিতদের স্থান দখল করে নিয়েছে বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত অনেক বিজ্ঞানী। ঠিক এ কারণেই অনেকে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের সাথে প্রাচ্যের বিভিন্ন রহস্যবাদী তত্ত্বের বিশেষত হিন্দুবাদ, বৌদ্ধবাদ ও তাওবাদের সাদৃশ্যতা খুঁজে পান। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দেবতা পরিবর্তনশীল এবং এ পরিবর্তনশীল তত্ত্বের দায়ভার বিজ্ঞানীদের। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এ পরিবর্তনশীলতা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টার নয়।

একমাত্র বিশ্বস্রষ্টাই বিশ্বের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বোধগম্যতায় আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন, আমিন।

রাব্বুল আলামিন (বিশ্ব প্রতিপালক)

পার্থিব বিশ্বজগতের সার্বিক কর্মকাণ্ড কিভাবে পরিচালিত হয় সে ব্যাপারে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক মতবাদ জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকলেও কোনো মতবাদই বিশ্বের পরিচালনায় সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়নি। সে সবের বৈজ্ঞানিক দার্শনিক আলোচনার বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের বক্তব্য উত্থাপন করব যা তাদের অসম্পূর্ণতার ফাঁক পূরণ করে একটি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-ধর্মীয় ঐক্যবদ্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস।

আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব পছন্দনীয় গুণবাচক নামসমূহের (আসমাউল হুসনা) একটি নাম হলো 'রব' এবং এটার পুরো প্রকাশ হলো রাব্বুল আলামিন- বাংলায় জগতসমূহের কিংবা বিশ্বের প্রতিপালক, ইংরেজীতে Sustainer of the worlds। প্রতিপালকের অর্থ হলো জীবিকা দানের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা, টিকিয়ে রাখা, অস্তিত্বশীল রাখা, সংরক্ষণ করা। তাই রাব্বুল আলামিনের অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা জীবিকা দানের মাধ্যমে সমস্ত- জীব-জগতসহ সারা বিশ্বজগতকে টিকিয়ে রেখেছেন এবং তার জীবিকা দান ব্যতিত উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের অস্তিত্বশীল থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যেভাবে সূত্রবদ্ধ, তাতে তারা অনুমান করছেন যে বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ও তার কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং আল্লাহ তায়ালার জীবিকা প্রদানের প্রয়োজন নেই কিংবা বিশ্বজগতের অস্তিত্বশীলতার জন্য জীবিকার বিষয়টি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রভুক্ত হয়নি কিংবা বিষয়টি তাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়টি তাদের অজ্ঞাত থাকার কথা নয় কারণ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বারবার নিজেই বলেছেন চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রের পরিভ্রমণে, দিনরাত্রির আবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য রয়েছে অপূর্ব নিদর্শন।

কিন্তু আমাদের জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে গ্রহ নক্ষত্রের পরিভ্রমণে খুঁজে পেলেন মহাকর্ষ শক্তি (Gravity) আর পদার্থের জড়তা (inertia) এবং এদের সমন্বয়ে সৌরলোকসহ মহাবিশ্বের স্বয়ংক্রিয় পরিচালনার চিত্র ফুটিয়ে তুললেন- বিশ্ব প্রতিপালন তো দূরের কথা, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের নাম নিশানার গন্ধমাত্র বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন না। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বললেন, গ্রহ

নক্ষত্রের পরিভ্রমণ পর্যবেক্ষণে তার অস্তিত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রমাণিত হবে এবং তিনি বিশ্বকে কিভাবে জীবিকা দান করেন সেটাও জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন।

কুরআনিক বক্তব্যে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মৌলিক বিভেদ ও অসামঞ্জস্যতা ফুটে উঠেছে এখন আমরা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

ইমাম গাযযালী তার 'দার্শনিকদের অসামঞ্জস্যতা' গ্রন্থে (তাহাফাতুল ফালাসিফাহ) দার্শনিকদের জন্য তিনি যে বিশটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যার সঠিক উত্তর দার্শনিকরা দিতে পারে না বলে দাবী করেছিলেন, তাদের মধ্যে ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রশ্ন ছিলো গ্রহ নক্ষত্রের গতি ও পরিভ্রমণের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে। এখানে উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে দার্শনিক আর বিজ্ঞানী একই অর্থে ব্যবহার করা হতো। এ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের প্রচেষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীতে কেপলার গ্রহদের গতি সংক্রান্ত গতিসূত্র আবিষ্কার করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটন মহাকর্ষীয় সূত্র প্রকাশ করেন। এতে ইমাম গাযযালীর প্রশ্নের আংশিক উত্তর পাওয়া গেল, পুরোপুরি নয় এবং এই আংশিক উত্তরকে সম্পূর্ণ উত্তর মনে করে এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হলো আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান। তার প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ বা মৌলিক সত্য অন্বেষণের প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল থেকে উধাও হয়ে গেছে এবং বর্তমানে আংশিক সত্যকে মৌলিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অসত্য তত্ত্বের পর তত্ত্বের বোঝায় ভারী হয়ে উঠেছে।

বস্তুত গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোতে বিভ্রান্তির কালোমেঘ এমনভাবে ছেয়ে আছে যে, প্রকৃত সত্য অন্বেষণ কঠিন হয়ে পড়েছে এবং সবাই দৃশ্যমান সত্য নিয়েই তৃপ্তিবোধ করছে। এ বিষয়ে মৌলিক সত্য আবিষ্কার হলে ইমাম গাযযালীর প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ চিরন্তন বিশ্বের সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার সুস্পষ্ট উত্তরও পাওয়া যাবে। ইমাম গাযযালী অভিযোগ করেছিলেন, অধিকাংশ দার্শনিক তত্ত্ব যৌক্তিকভাবে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার চেয়ে কিছু বিশিষ্ট দার্শনিকদের মতবাদের অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করা হয় মাত্র এবং একই অভিযোগ বর্তমান তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ যখন মানমন্দির নির্মাণ করে গ্রীক তথা টলেমীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে গেলেন, তখন দেখা গেল মহাকাশে পর্যবেক্ষণগত বাস্তব তথ্যের সাথে তত্ত্বের গাণিতিক তথ্য অসঙ্গতিপূর্ণ। এ অসঙ্গতি দূরকরণের প্রচেষ্টায় মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ টলেমীর তাত্ত্বিক ও গাণিতিক কাঠামোকে সংশোধন ও বিকল্প তত্ত্বের অন্বেষণ করতে

থাকেন। ফলে ত্রয়োদশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য আবিষ্কার হয় : একটির নাম হলো 'তুসী সংযোজন (Tusi Couple)' দ্বিতীয়টি হলো 'উরদি লিমা (Urdi Lemma)'। প্রথমটি আবিষ্কার করেন নাসির উদ্দীন তুসী এবং দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করেন মুয়াইয়াদ আল-দীন আল উরদি। পরবর্তীতে ইবনে শাথীর এ দু'টি উপপাদ্যকে একত্রে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালান। ইবনে শাথীরের অঙ্কিত চিত্রলেখা এবং ষোড়শ শতাব্দীর কোপারনিকাসের চিত্রলেখা খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখকগণের প্রায় সবাই একমত যে, পৃথিবী কেন্দ্রীক বিশ্বের পরিবর্তে সূর্য কেন্দ্রীক ধারণায় পৌঁছানোর জন্য এ দু'টি উপপাদ্য ছাড়া কেবল টলেমীর 'আল-ম্যাগেষ্ট' ও ইউক্লিডের 'এলিমেন্ট' সংযোগে মানমন্দিরবিহীন গবেষণায় এরকম যুগান্তর সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব। (জর্জ সালিবা : ইসলামী বিজ্ঞান ও ইতালীতে বিজ্ঞানের রেনেসাঁ)

কিন্তু ইসলামী সভ্যতায় ঐশ্বরিক চৈতন্যবোধ ও মানবীয় অর্জিত জ্ঞানের যে সমন্বয় সাধনের কাজ শুরু হয়েছিল তা ব্যাহত হয় যখন এটা ধর্মগ্রন্থধারী বিস্তীর্ণ উর্বর চন্দ্রিকাঞ্চল (Furtile crescent)সহ ভূমধ্যসাগরের পূর্বপাড় থেকে ধর্মগ্রন্থহীন পশ্চিমপাড়ে স্থানান্তরিত হয়। ফলে পশ্চিমা দেশসমূহের সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির শুরুতেই প্রকৃত ঐশ্বরিক চৈতন্যবোধের বিলুপ্তি ঘটে এবং বিজ্ঞান হয়ে উঠে মূল্যবোধ শূন্য জ্ঞানের খোলস মাত্র।

কোপারনিকাসের সূর্য কেন্দ্রীক সৌরলোক তত্ত্বের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা হিসেবে আসে কেপলারের গ্রহ বিষয়ক সূত্র এবং পদার্থিক সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা হলো নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র। কিন্তু এ সূত্রে নিউটন বুদ্ধির অগম্য একটি শক্তির সংযোগ ঘটালেন যার নাম পদার্থের আকর্ষণ শক্তি এবং এই শক্তির ভারসাম্য আনার জন্য দ্বিতীয় আরেকটি দুর্বোধ্য শক্তির সংযোগ করলেন যার নাম হলো পদার্থের গতি জড়তা এবং এই দুই শক্তির সমন্বয়ে গ্রহ নক্ষত্রের গতি ও পরিভ্রমণ ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু এই দুই শক্তির উৎস সমন্ধে কোনো তথ্য দিতে ব্যর্থ হলেন। ফলে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা (Continental philosophers) মহাকর্ষ সূত্রকে বাস্তবতা বিবর্জিত বলে অস্বীকার করলেন এবং লিবনিজের (Leibnty) নেতৃত্বে তারা এটাকে আখ্যায়িত করলেন গাণিতিক সৌন্দর্যে আবৃত ভুতুড়ে বিজ্ঞান (Occult science) বলে। কারণ নিউটন তার সূত্র দ্বারা এমন শক্তিকে পরিমাপ করার প্রয়াস করলেন যার উৎস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু লিবনিজের সাথে নিউটনের ক্যালকুলাস আবিষ্কারের মূল দাবিত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকার কারণে এবং নিউটন ইংল্যান্ডের রাজকীয় পরিষদে আজীবন সদস্য ও প্রবল রাজনৈতিক প্রতাপে

মহাকর্ষ সূত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিউটনের ভুতুড়ে বিজ্ঞানকে প্রতিহত করার মতো শক্তিশালী ছিলো না এবং এটি বিজ্ঞানের রাজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে বিংশ শতাব্দীতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব যা আরো বেশী ভৌতিক কিন্তু ইউরোপীয় তথা সারা বিশ্বের জ্ঞানীগুণীদের প্রতিবাদ তাকে প্রতিহত করতে পারেনি এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ভৌতিকতাও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের পদমর্যাদায় ভূষিত হয় এবং এটার বিকল্প প্রকৃত জ্ঞানের অন্বেষণ ব্যাহত হয় । জ্ঞানের নামে কিছু সত্যের সাথে কিছু মিথ্যের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সংমিশ্রণের প্রবণতা ও তাকে সার্বিক জ্ঞান বলে চালিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা এবং প্রকৃত সত্য অন্বেষণে প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর তৈরীর প্রবণতাকে আমরা বলব জ্ঞানের অপবিত্রকরণ। কিন্তু আমরা জ্ঞানের অপবিত্রকরণের প্রক্রিয়াকে সনাক্ত করব যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সত্য সন্ধানী জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যা আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ও মহাসত্যের বাণীর সাথে কোনো অবস্থাতেই বৈরীভাবাপন্ন হবে না।

নিউটন তার প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন মহাকর্ষ শক্তির মূল উৎস ও কারণ সম্বন্ধে তার কোনো প্রকৃত ধারণা নেই, প্রকৃতির কোনো অজ্ঞাত সত্তা থেকে এ শক্তি পদার্থের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত হবার সম্ভাবনা আছে এবং এ ব্যাপারে তিনি বেশী দূরকল্পন (Hypotheses non fingo) করা থেকেও বিরত থাকবেন।

"It is inconceivable that inanimate brute matter should, without the mediation of something else which is not material, operate upon and affect other matter without mutual contact...That gravity should be innate, inherent, and essential to matter, so that one body may act upon another at a distance through a vacuum, without the mediation of anything else, by and through which their action and force may be conveyed from one to another, is to me so great an absurdity that I believe no man who has in philosophical matters a competent faculty of thinking can ever fall into it"

From Newton's letter to Bentley,

"Hitherto, we have explained the phenomena of the heavens and of our sea by the power of gravity, but have not yet assigned the cause of this power. This is certain, that it must proceed from a cause that penetrates

to the very centres of the sun and planets, without suffering the least diminution of its force; that operates not according to the quantity of the surfaces of the particles upon which it acts (as mechanical causes used to do) but according to the quantity of the solid matter which they contain, and propagates its virtue on all sides to immense distances, decreasing always in the dulicate portion of the distances.... Hitherto I have not been able to discover the cause of those properties of gravity from the phenomena, and I frame no hypothesis." Principia Mathmetica Book 3, Section 4; Reading 6;

তবে তিনি এটাও বলেছেন, যুক্তিবোধসম্পন্ন কারো পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয় যে অচেতন জড় পদার্থের মধ্যে কোনো না কোনো প্রকার আন্ত:সংযোগ বা মাধ্যম ব্যতিরেকে একে অপরকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে। (অর্থাৎ তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকে নিজে বিশ্বাস করতে পারেননি, যেমন শেষ বয়সে নিজ বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেননি আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাংক, ডারউইনসহ আরো অনেকে। এরপরও তিনি মনে করতেন সর্বস্থানব্যাপী অসীম এক প্রকার আত্মিক সত্তা যা পদার্থকে গাণিতিক সূত্র মতো গতিশীল হতে কার্যকর থাকে।

Newton even drafted a new set of corollaries to Proposition 6 of Book 3 of the Principia, Corol 9: There exists an infinite and omnipresent spirit in which matter is moved according to mathematical laws.

নিউটন মহাকর্ষের মূল কারণ হিসেবে ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন (Gravity had its Foundation only in the arbitrary will of God)।

নিউটন বিশ্বাস করতেন না মহাকর্ষ শক্তি পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, বরং এ শক্তির উৎস পদার্থ বহির্ভূত কোনো সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের মূলধারার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এ শক্তির মূল উৎসের সন্ধানের পরিবর্তে এটাকে পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, এমনকি ইমানুয়েল কান্টের মতো দার্শনিকও তার Metaphysical foundation of natural science গ্রন্থে মহাকর্ষ শক্তিকে পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বলে বৈধতা প্রদান করে দর্শনকেও কলুষিত করলেন এবং জ্ঞানের অপবিত্রকরণকে আরো একধাপ এগিয়ে দিলেন এবং সত্য অন্বেষণে নিজ দায়িত্ব শেষ করলেন। বিগত দুই শতাব্দীর বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং ধর্মীয় চৈতন্যবোধে উদ্বুদ্ধ জ্ঞানীগুণীজন পর্যন্ত বিষয়টির ভয়ানক

পরিণতি উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির বিষয়ে বোধগম্যহীনতায় হা-হুতাশ করেছেন। নিউটনীয় বিজ্ঞানে একই পদার্থে দু'টি ভৌতিক শক্তি যুক্ত হয়েছে : একটি হলো তার গতি জড়তার শক্তি এবং অন্যটি তার মহাকর্ষ তত্ত্বের আকর্ষণ শক্তি। যেহেতু এ দু'টি শক্তির প্রকৃত উৎস সম্বন্ধে বর্তমান স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশ্বের অধিকাংশ পত্র পত্রিকা, জার্নাল, ম্যাগাজিনে কোনো তথ্য নেই এবং এ প্রসঙ্গে কারো অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলও নেই এবং তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে মূল্যবোধের অতীত হয়ে গেছে, তাই বিজ্ঞানীরা এটাকে পদার্থের চিরস্থায়ী শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করে চিরন্তন বিশ্বের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলছেন। তাই বিগ ব্যাংগ তত্ত্বীয় বিশ্ব প্রসঙ্গে কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনশত বছরের সেই নিউটনের সম্মানিত রাজকীয় সিংহাসনে বর্তমান পদাসীন স্টিফেন হকিং বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস প্রসঙ্গে বলেছেন–

"বর্তমান দৃশ্যমান বিশ্বের কণার সংখ্যা ১০৮০, আপেক্ষিকবাদী ও কণাবাদী বলবিদ্যা শক্তি থেকে পদার্থ সৃষ্টির অনুমোদন করে। কিন্তু পদার্থ সৃষ্টির শক্তি এলো কোথা থেকে? উত্তর হলো এ শক্তি ধার করা হয়েছিল মহাকর্ষীয় বলের কাছ থেকে। অপর মহাকর্ষীয় শক্তির কাছে মহাবিশ্বের একটি বিরাট ঋণ রয়েছে– বিশ্বের অন্তিম কালের আগ পর্যন্ত এ মহাকর্ষীয় ঋণ শোধ করতে হবে"। (স্টিফেন হকিং : কৃষ্ণবিবর ও শিশু মহাবিশ্ব)

ত্রিকালদর্শী ঋষি স্টিফেন হকিং বিশ্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি মহাকর্ষীয় বলের কাছ থেকে ঋণ করতে চান কিন্তু নিউটন খোদ মহাকর্ষীয় শক্তির উৎস সম্বন্ধে কিছু জানেন না এবং এরা দু'জনেই আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী! স্টিফেন কার কাছ থেকে শক্তি ধার করে কার কাছে পরিশোধের কথা বলছেন! এতে প্রমাণ হয় এক বিজ্ঞানী আরেক বিজ্ঞানীর মূল গ্রন্থ কখনো অধ্যয়নের প্রয়োজনবোধ করেন না। বিজ্ঞানের অনেক ইতিহাস লেখকের দাবী, এক বিজ্ঞানীর গ্রন্থ আরেক বিজ্ঞানীর কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো বোধগম্যও নয়।

নিউটনের পূর্ব পর্যন্ত পদার্থের গতির বিষয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো পদার্থের উপর আরোপিত শক্তি কিংবা পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তি কার্যের মাধ্যম শেষ হয়ে গেলে পদার্থের গতি থেমে যাবে এবং তা স্থির হয়ে পড়বে। কিন্তু এটাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করলে এবং নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রে তা প্রয়োগ করলে পৃথিবী পৃষ্ঠে চন্দ্র পড়ে যাবে এবং সূর্যের পিঠে পৃথিবীসহ সব গ্রহ পড়ে যাবে এবং নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই মহাকর্ষ তত্ত্ব বৈধ বলে প্রতিষ্ঠা

করতে নিউটনের প্রথম গতিসূত্রে বলা হলো বাইরে থেকে কোনো শক্তি প্রয়োগ না করলে পদার্থ স্থির থাকবে কিংবা গতিশীল পদার্থ সরল রেখায় চলতে থাকবে এবং এটাই হলো পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যার নাম জড়তা।

গতিশীল পদার্থের চলমান থাকার প্রবণতার পূর্ব ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে স্ববিরোধী এবং অযৌক্তিক- এখানে স্থিতি আর গতির অর্থ একই হয়ে যায়, পক্ষান্তরে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রে স্থিতিশীল পদার্থকে সরল রেখায় গতিশীল করতে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এখানে আমরা জ্ঞানের মন্দিরে ভৌতিক শক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাই। কিন্তু যাহোক প্রথম সূত্রে গতিশীল পদার্থ কি বেগে চলবে এবং বিশ্বের ছোট বড় সব পদার্থ একই বেগে চলবে নাকি ভিন্ন ভিন্ন বেগে চলবে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি এবং বিগত তিনশত বছরে এ প্রশ্নও কেউ উত্থাপন করেননি। কতকাল চলবে এ প্রশ্ন উহ্য রয়ে গেল এবং সবাই ধরে নিলেন, এটা অনন্তকাল চলবে কোনো প্রকার শক্তি ছাড়াই।

একটি সীমিত সত্তার মধ্যে অকারনিকভাবে অনন্তের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হলো নিউটনের অজ্ঞাত শক্তির পরিমাপক মহাকর্ষ সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত শক্তির ভারসাম্য আনার জন্য। ফলে দু'টি অজ্ঞাত শক্তি একটি সূত্রে আবদ্ধ হলো এবং তা থেকে যে ফল পাওয়া গেল সেটাকে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরা এটি জ্ঞাত বিষয় বলে বোধগম্য হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিলেন। দু'টি অজ্ঞাত বিষয় যোগ করলে যে একটি জ্ঞাত বিষয় পাওয়া যায়– এই জ্ঞান হলো আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু যে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এ দু'টি শক্তির অজ্ঞাত উৎসের পুরো তথ্য দিতে পারবেন না, সে পর্যন্ত বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞাত বিষয় বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আমরা এ দু'টি অজ্ঞাত শক্তির উৎসকে জ্ঞাত করার চেষ্টা করব এবং আশা করব এতে বিজ্ঞান থেকে ভুতুড়ে বৈশিষ্ট্য দূর হয়ে যাবে এবং বিজ্ঞান পবিত্র ও সহজবোধ্য হয়ে যাবে।

এখন আমরা এ প্রসঙ্গে প্রথম শক্তি অর্থাৎ মহাকর্ষ শক্তির উৎস সন্ধানে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা দিকে মনোযোগ দেব।

কেপলারের সৌরলোক সম্বন্ধে গ্রহদের পরিভ্রমণের যে সূত্র প্রকাশ করেন তারপর থেকেই এটার কারণ হিসেবে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ হতে থাকে। এদের একটি হলো কার্টেসিয়ান আবর্ত (Cartesian vortex) এবং এটার প্রবক্তা ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতবিদ ডেকার্ট (Descartes)। লিবনিজসহ ইউরোপের মূলভূখণ্ডের অনেক দার্শনিক বিজ্ঞানী এটার সমর্থক ছিলেন। এটার মূল ধারণা হলো মহাকাশে প্রবাহমান ইথারে গ্রহ নক্ষত্রের বিশাল আকৃতির বস্তুপিণ্ডের উপস্থিতিতে যে এক

প্রকার ঘূর্ণনের আবর্ত সৃষ্টি হয় সে কারণে গ্রহ সূর্যের চারপাশে ঘুরে যেমনটি আমরা দেখতে পাই, নদীর স্রোতে ডুবন্ত কোনো পাথরে যে আবর্ত সৃষ্টি হয় তাতে ছোট ভাসমান অনেক বস্তু ঘুরতে থাকে। এ তত্ত্বটির কোনো গাণিতিক কাঠামোতে সূত্রবদ্ধ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে ইতিহাস নিরব, তবে ডেকার্ট ও লিবনিজ দু'জনই দক্ষ গণিতবিদ ছিলেন বিধায় এ সম্ভাবনা যথেষ্ট।

কিন্তু বর্তমানে মহাকর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত তার প্রথম প্রস্তাব করেন রবার্ট হুক এবং তিনি সাধারণ ভাষায় পদার্থের আকর্ষণ শক্তির একটা সম্ভাব্য ধারণা হিসেবে বর্ণনা করেন। নিউটনের কাছে যা দিয়ে গ্রহ নক্ষত্রের গতির ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তিনি এটাও প্রস্তাব করেন যে এ শক্তি পদার্থের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। নিউটন গণিতে খুবই দক্ষ থাকায় তিনি এটাকে গণিতের ভাষায় সূত্রবদ্ধ করেন। এ সূত্র নিউটনের মৌলিক আবিষ্কার হিসেবে পরিচিত হতেই রবার্ট হুক অভিযোগ করেন যে তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং নিউটনের সমর্থকরা মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রসঙ্গে নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার গল্প জনপ্রিয় করে তুলে নিউটনকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। পুরো বিষয়টি সঠিক বোধগম্যের জন্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়োজন যা আমাদের বক্তব্যের মূল বিষয় নয়।

কিন্তু নিউটনের গণিত মহাকর্ষীয় শক্তির উৎস বর্ণনায় ব্যর্থ হলো। কার্যত নিউটনীয় বিজ্ঞানে ইথার বা বস্তু বহির্ভূত অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি অস্বীকার করা হলো এবং পরবর্তিতে স্বীকার করা হলেও দ্বিতীয় বার এটাকে অস্বীকার করলেন আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে। নিউটনীয় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মহাদেশীয় বিজ্ঞানীরা নানা কারণে শেষ পর্যন্ত হার মানলেন এবং প্রতিবাদের ঝড় এক সময় থেমে গেল। মহাকর্ষ শক্তির উৎসের গ্রহণযোগ্য তত্ত্বের প্রস্তাব করলেন নিউটনের অতি ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু এবং সুইস বিজ্ঞানী নিকোলাস ফেটিও ডি ডুইলিয়ার (Nicolas Fatio de Duillier)। এটা হলো নিউটনের গণিত আর কার্টেসীয়ান আবর্তের ধারণার সমন্বয় সাধন। (এটা বাদেও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন রকম তত্ত্ব ও গাণিতিক প্রস্তাব পেশ করেছেন কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্যন্ত টেকেনি এবং এখনো অনেকে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজছেন)।

নিকোলাসের তত্ত্বে নিউটনের গাণিতিক কাঠামো ঠিক রইল কিন্তু নিউটনের মূল ধারণাকে উল্টে দেয়া হলো। নিউটনের তত্ত্বের প্রস্তাব হলো পদার্থের আকর্ষণ কিন্তু ফেটিওর তত্ত্বে এটা হলো পদার্থের চারপাশ থেকে অতি সূক্ষ্ম পদার্থের ভীষণ গতির কারণে এক প্রকার ধাক্কা বা চাপপ্রয়োগ। ফলে নিউটনের প্রস্তাবনা হলো

আকর্ষণ তত্ত্ব (Pulling gravity) আর ফেটিওর প্রস্তাবনা হলো চাপপ্রয়োগ তত্ত্ব (Pushing gravity)।

ফেটিওর তত্ত্ব মতে স্থান প্রকৃতপক্ষে শূন্য নয় বরং অতি সূক্ষ্ম অতিপ্রাকৃতিক ও চতুর্দিকে (omni-dimentional ultra mundane particles) প্রচণ্ডবেগে গতিশীল কণায় পূর্ণ যা গ্রহ নক্ষত্রকে চারপাশ থেকে ধাক্কা বা চাপ প্রয়োগ করে, এমনকি গ্রহ নক্ষত্র ভেদ করে চলে যায়। তার মতে কোনো ঘন পদার্থই প্রকৃত অর্থে চরম ঘনত্ব প্রাপ্ত নয় বরং সব পদার্থের অণু পরমাণুবিক গঠনে বিপুল পরিমাণে ফাঁক রয়ে গেছে যার মধ্য দিয়ে অতি সহজেই অতি প্রাকৃতিক কণা ভেদ ও অতিক্রম করতে পারে, যা বর্তমান পদার্থিক অণু পরমাণুর গঠন থেকে প্রমাণিত। তিনি গ্রহ নক্ষত্রকে বিবেচনা করলেন কাঁচেরপিণ্ড বা স্বচ্ছ পানির মতো যার মধ্য দিয়ে অতিপ্রাকৃতিক কণা প্রচণ্ডবেগে অতিক্রম করে যেতে পারে এবং দু'টি বস্তু কাছাকাছি অবস্থান করলে একে অপরের গায়ে চাপে যে গড়মিল সৃষ্টি করে তা এক পদার্থ অপর পদার্থে এক ধরনের ছায়ার মতো প্রতিভাস হয় এবং এই ছায়ার ঘনত্বের জ্যামিতিক গ্রাফ অংকন করলে দেখা যায় এটা নিউটনের গণিতের সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সেটাই আকর্ষণ শক্তি হিসেবে দৃশ্যমান হয়। তাই এ শক্তি নিউটনের প্রস্তাবিত গণিত সূত্র অনুসরণ করে।

এটা যখন তিনি নিউটনের সামনে উপস্থাপন করেন, ইতিহাসে তার বিভিন্ন বর্ণনা আছে : কখনো বলা হয় নিউটন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কখনো বলা হয় তিনি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং যৌথভাবে প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকার নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাবও করেছিলেন এবং এক পা এগিয়ে দুই পা পিছিয়ে গেছেন। ফেটিও তার তত্ত্ব ব্রিটিশ রয়াল সোসাইটির সভায়ও উপস্থাপন করেছিলেন এবং তার মূল পাণ্ডুলিপিতে নিউটন, হ্যালী ও ডেনিস বিজ্ঞানী হুইজেনস (Newton, Halley, Huygens) স্বাক্ষরও করেছিলেন।

Fatio was in communication with some of the most famous scientists of his time - some of them signed his manuscript.

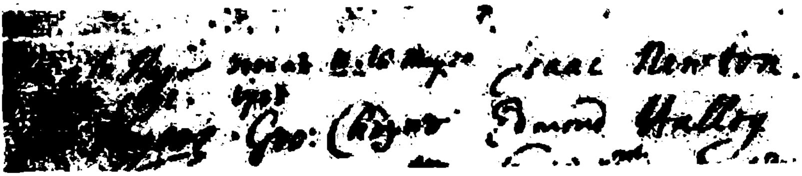

P8: Signatures of Halley, Huygens and Newton on Fatio's paper

কিন্তু নিউটন কিছু সময়ের জন্য মানসিক ভারসাম্য (Nervous breakdown) হারিয়ে ফেলেন এবং ফেটিও প্রোটেষ্টান্ট খ্রিস্টান ছিলেন বিধায় ক্যাথলিকদের বিভীষিকাময় জুলুম নির্যাতনে একটি রহস্যময় ধর্মীয় গোষ্ঠীতে জড়িয়ে পড়ে কিয়ামত আসন্ন মতবাদ প্রচারের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দৈহিকভাবে আরো বেশী অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করতে থাকেন। নিউটন সুস্থ হয়ে উঠার পর তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আগের মতো গভীর হয়নি কিন্তু তিনি ফেটিওর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমনকি নিউটন নিজের লেখা প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের ফুটনোটে নিকোলাসের তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন।

After describing the necessary conditions for a mechanical explanation of gravity, Newton wrote in an (unpublished) note in his own printed copy of the "Principia" in 1692:

"The unique hypothesis by which gravity can be explained is however of this kind, and was first devised by the most ingenious geometer Mr. N. Fatio."

নিকোলাসের প্রস্তাব মহাকর্ষের শক্তির যুক্তিযুক্ত উৎস ব্যাখ্যা করতে সমর্থ কারণ এ শক্তি স্পষ্টত পদার্থের চারপাশের অতি সূক্ষ্ম কণার গতি থেকে প্রাপ্ত। এ তত্ত্ব নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের প্রভাবে ও নানা ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে জনসম্মুখে অপ্রকাশিত থেকে যায়। এটাকে কিছু বিকৃত ও পরিবর্তিতরূপে পুনরায় জনসম্মুখে নিয়ে আসেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্জ লুইচ লিসেজ (Georges Louis Lesage) এবং বর্তমানে বিশ্বে এটা পরিচিত লিসেজ ছায়া তত্ত্ব (Lesage's shadows theory) নামে, (তিনি অনেক চেষ্টা ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও নিকোলাস ফেটিওর মূল পাণ্ডুলিপি হস্তগত করতে সক্ষম হননি এবং কেবলমাত্র ১৯২৯ ও ১৯৪৯ সালে এটা প্রকাশিত হয়, কিন্তু তখন নিউটনের চেয়ে আরো বেশী ভৌতিক আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা যৌথভাবে এটাকে পরিত্যক্ত ও মূল্যহীন ঘোষণা করে)। এই তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হলো অতিপ্রাকৃতিক কণা পদার্থকে ভেদ করে চলে যায় তা সে পদার্থ যত বড়ই হোক না কেন, সেটা পৃথিবী, সূর্য হোক কিংবা তার চেয়ে বড় কোনো নক্ষত্র। তবে পদার্থের আকার, ভর ও ঘনত্বের পরিমাণে অভ্যন্তরে কণাদের গতিপথে যে বাধার সৃষ্টি হয় সেটাই হলো তার শক্তির উৎস।

বিগত দুই শতকের বিখ্যাত অনেক পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্যারাডে, ল্যাপলাস, ম্যাক্সওয়েল, কেলভিন, থমসন, লরেন্টস, পয়েনকেয়ার, ফাইনম্যানসহ আরো

অনেকে এ তত্ত্ব নিয়ে কমবেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, কেউ এটাকে আরো বর্ধিত করে নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন, এটার মূলমর্ম উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন এবং বর্তমানে জীবিত অনেক বিজ্ঞানী আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম বিপরীতে চিরায়ত বিজ্ঞানে বিশ্বাসী হয়ে এটা নিয়ে গবেষণা করছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের পরিপন্থি বিধায় অনেকে আবার এটার বাস্তব উপযোগিতা নিয়ে সন্দেহ করছেন। তবে এটা মহাকর্ষ শক্তির উৎস ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, পক্ষান্তরে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বে শক্তির উৎস অজ্ঞাত।

ল্যাপলাস প্রথমে মহাকর্ষ শক্তির গতিবেগ পরিমাপের চেষ্টা করেন এবং প্রমাণ করেন এটার গতিবেগ আলোর চেয়ে মিলিয়ন গুণ বেশী এবং বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন এটার গতিবেগ আলোর চেয়ে হাজার বিলিয়ন গুণ বেশী। হেনরী পয়েনকেয়ারসহ আরো অনেকে বিভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ বিশ্লেষণ করে বলছেন এ তত্ত্বে বর্ণিত অতিপ্রাকৃতিক কণাদের গতিবেগ হবে আলোর চেয়ে ট্রিলিয়ন গুণ বেশী (তার হিসাবে এটার গতিবেগ আলোর চেয়ে $১০^{১৭}$ গুণ বেশী)। তাই বর্তমান বিজ্ঞানীদের মূল আপত্তি হলো এ রকম অকল্পনীয় বেগে কোনো কণা বা বিকিরণ বা তরঙ্গ বা সূক্ষ্ম কোনো প্রকার শক্তি পদার্থ ভেদ করে চলে গেলে পদার্থের মধ্যে যে শক্তি শোষিত হবে তাতে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হবে এবং পদার্থ (উদাহরণস্বরূপ পৃথিবী) সে উত্তাপে ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে পড়বে। আরেকটি আপত্তি হলো বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্যে কেবলমাত্র নিউট্রিনো কণা পৃথিবী, কিংবা সূর্য কিংবা আরো ভারী ও বিশাল নক্ষত্র ভেদ করতে সক্ষম কিন্তু এটার গতিবেগ আলোর চেয়ে বেশী নয় এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব আলোর চেয়ে বেশী গতি অনুমোদন করে না। কিন্তু আলোকের গতির ধ্রুবকের ধারণা আপেক্ষিক তত্ত্বের জঘণ্যতম বিভ্রান্তি যা আমরা "আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের বিভ্রান্তি" নিবন্ধে আলোচনা করেছি এবং নিউট্রিনো কণা সূর্য বা পৃথিবী ভেদ করে গেলে কোনো তাপ উদ্ভবের দাবী বিজ্ঞানীরাও করেন না। এমনকি আমাদের অর্থাৎ মানব দেহে প্রতি সেকেন্ডে ৫০ ট্রিলিয়ন নিউট্রিনো ভেদ করে যাচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করেছেন। এ তত্ত্বে প্রস্তাবিত কণা নিউট্রিনোর চেয়ে সূক্ষ্ম।

এদিকে আধুনিক বিজ্ঞানে স্থান (Space) যে শক্তি সম্পন্ন তার যথেষ্ট পর্যবেক্ষণগত উপাত্ত বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন স্থানে এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকে এটার নাম ছিলো ইথার যার যথেষ্ট অপব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের হাতে এবং পৃথিবীর বিখ্যাত শত শত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক একবার এটার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন দ্বিতীয়বার

অস্বীকার করেছেন এবং এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন। এটার আধুনিক পরিভাষা হলো জিরো পয়েন্ট এনার্জি (Zero point energy), ভ্যাকাম এনার্জি (Vucuum energy), কোয়ান্টাম ভ্যাকাম এনার্জি (Quantum vucuum©), শূন্যতার প্রকম্পন (Vacuum fluctuation), জিরো এনার্জি ফোটন সমুদ্র (Zero energy photon sea), বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় সমুদ্র (Electro-magnetic sea), ইলেকট্রনিক সমুদ্র (Electronic sea), চরম বিকিরণ শক্তি (Prime radient force), ডিরাক ঋণাত্মক শক্তিসমুদ্র ইত্যাদি। সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণগত প্রমাণিত শক্তির নাম হলো কাশিমীর বল (Casimir force)। এসব বিষয়ে প্রচুর বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র চারপাশে ছড়িয়ে আছে। ফলে বর্তমান অনেক বিজ্ঞানী এ তত্ত্বের প্রতি আগ্রহী এবং এটাকে পুনরায় উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ দাবী করছেন, স্থানিক কাঠামোর শক্তির ঘনত্ব অতি উচ্চমাত্রায় পরিবেষ্টিত যা বিশ্বের সবচেয়ে কঠিনতম পদার্থের শক্তির ঘনত্ব থেকেও বেশী। বিজ্ঞানীরা এ শক্তিকেই নাম দিয়েছেন কৃষ্ণ পদার্থ (Dark matter) বা কৃষ্ণশক্তি (Dark energy)। কারণ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মহাকর্ষ তত্ত্ব দিয়ে নক্ষত্র নীহারিকার গতি ব্যাখ্যা কঠিন হয়ে পড়েছে।

স্থানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের সব উন্নত সভ্যতার দার্শনিক বিজ্ঞানী ধার্মিকদের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে তর্ক বিতর্ক চলে আসছে এবং সেসব বিশ্ব ইতিহাসের সব বিশ্বকোষের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে। গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানে স্থানকে শূন্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অণু পরমাণু শূন্যস্থানে গতিশীল বলে ধারণা করা হয়েছে। অনেকে আবার স্থানকে চরম অর্থে শূন্যস্থান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। আমরা সেসব বিশ্লেষণ করে তা থেকে যে সারমর্ম পাই তাতে স্থান প্রকৃত অর্থেই শূন্য নাকি তার বিশেষ কোনো শক্তি আছে, তা অনন্ত নাকি সীমিত, এ বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু এখন আমরা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণগত প্রমাণ পাচ্ছি, স্থান প্রকৃত অর্থে শূন্য নয়, সেখানে কোনো না কোনো প্রকার শক্তির উপস্থিতি বিদ্যমান। আলকিন্দি "প্রথম দর্শন" (ফি আল ফালসিফাত আল আউলা) গ্রন্থে শূন্যস্থানের অস্তিত্ব অসম্ভব বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। ইমাম গাযযালীর ভাষায় স্থান বলতে আমরা যা কিছুই অর্থ করি তবে তা আমাদের বিশ্বের অন্তর্গত, আমাদের বিশ্ব বহির্ভূত কোনো স্থান থাকতে পারে না। ফলে কোনো অর্থেই মহাবিশ্ব কিংবা স্থান কিংবা শূন্যস্থান সম্মিলিতভাবেও অসীম হতে পারে না। এদিকে বিজ্ঞানীদের সমস্ত গবেষণায় শক্তির মূল উৎস বর্তমানে তথাকথিত

শূন্যস্থানে গিয়ে ঠেকেছে। আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের অস্তিত্ব লাভের জন্য শূন্যস্থানের কাছে গিয়ে অসীম শক্তি পাবার জন্য ক্রন্দন করছেন। কিন্তু স্থানের গাঠনিক কাঠামোতে শক্তি এলো কোথা থেকে? এদিকে বিশ্বস্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েও যারা শূন্যস্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তারা নিজের অজান্তে দ্বৈত সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েন, কারণ এতে স্রষ্টা বহির্ভূত আরেকটি সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়– যা হলো অসীম শূন্যস্থান আর এটা ইসলামী তৌহিদের মূল চেতনার বিরোধী। যদি আমরা স্থানের কাঠামোতে শক্তির অস্তিত্বের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই তবে একসাথে অনেকগুলো ধার্মিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের জটিলতা ও হাজার বছরের বিতর্কের অবসান হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহের প্রেক্ষাপটে আমরা এখন একটি উদ্ধৃতি দেব পৃথিবীর সমস্ত তথ্যের সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের একমাত্র উপায় হিসেবে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার পরম অবিসংবাদিত সত্য ও পবিত্র বাণী বিশ্বগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াত :

আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তার জ্যোতির উপমা যেন একটি কাঁচের আবরণ, আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয় প্রতিচ্যেরও নয়, অগ্নি ওকে স্পর্শ না করলেও ওর তৈল আলো দিচ্ছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি... তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ... ।"

কুরআনিক পরিভাষায় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কিংবা আকাশ ও জমিনসমূহ বলতে সমস্ত বিশ্বজগৎ বুঝায় অর্থাৎ মহাবিশ্বের সব পদার্থসহ সব শূন্যস্থান তা যতদূর পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত হোক না কেন সবকিছু সম্মিলিতভাবে বুঝায় এবং সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব আল্লাহর তায়াল্লার জ্যোতিতে পূর্ণ। তাই স্থান বা অনেকের ভাষায় স্থান-কাল (Space time continum) প্রকৃত অর্থেই শূন্য এবং অর্থহীন এবং অস্তিত্বহীন যতক্ষণ না সেখানে আল্লাহর জ্যোতি বা তার উপজাত কোনো শক্তি আছে। স্থান হলো শক্তিময় একটি ক্ষেত্র যা পদার্থকে সৃষ্টি ও ধারণ করে এবং স্থান ব্যতিত পদার্থের অস্তিত্ব লাভ অসম্ভব। স্থানের প্রকৃতি নিয়ে ঠিক এরকম বক্তব্য পাওয়া যায় নিউটনের জেনারেল স্কোলিয়াম (General Scholium) ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ ডি গ্র্যাভিটেসনে (De Gravitation)। এই জ্যোতি ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ তার উপমা দিয়ে বর্ণিত যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে রাখবেন এবং প্রজ্জ্বলন শেষ হতেই স্থান-কালের অস্তিত্ব শেষ। যয়তুনের তেল দিয়ে জ্বালানো প্রদীপের অর্থ সম্ভবত শীতল আলো এবং এটা সরাসরি তাপ বিকিরণ করে না এবং পদার্থ ভেদ করে গেলেও কোনো তাপের উদ্ভব হয় না। এ কারণে

বিশ্বের গড় তাপমাত্রা পরম হিমাংকের কাছাকাছি এবং বিশ্বে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন নক্ষত্র বিপুল তাপ বিতরণ করেও বিশ্বের তাপমাত্রাকে পরম হিমাংক থেকে তেমন বৃদ্ধি করতে পারেনি।

এখানে নক্ষত্র বা সূর্যকে তুলনা করা হয়েছে কাঁচের আবরণের সাথে যার মধ্য দিয়ে আল্লাহর জ্যোতি ভেদ করে চলে যায় এবং তারই প্রেক্ষিতে সূর্য উজ্জ্বল আলো বিতরণ করে। অর্থাৎ সূর্য বা নক্ষত্র আল্লাহর জ্যোতির কিছু অংশ লাভ করে এবং তার উপজাত হিসেবে সে দৃশ্যমান আলো বিতরণ করে। কিন্তু আল্লাহর জ্যোতি নির্দিষ্ট কোনো দিক থেকে প্রবাহিত নয়, সেটা পূর্বের নয়, পশ্চিমের নয়, উত্তরের নয়, দক্ষিণেরও নয়, উপর থেকেও নয়, নিচের থেকেও নয়; সেটা আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বের সবদিকে সমানভাবে প্রবাহিত। আর সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হলো সূর্যের আলোক বিকিরণ মৌলিকভাবে তার নিজস্ব নয়, এটা আল্লাহর জ্যোতি প্রাপ্তির উপজাত। আল্লাহর জ্যোতি আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়, আমাদের কাছে দৃশ্যমান কেবল সূর্যের আলো। সূর্য বা নক্ষত্রের এ বৈশিষ্ট্যকে আমরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করব এবং এজন্য আমরা সূর্যের আলোক বিকিরণ প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক তথ্যকে আমরা সঠিকভাবে উপস্থাপন করব।

আল্লাহর জ্যোতি থেকে স্থানের কাঠামো (Fabrics of space) যে শক্তি লাভ করে যাকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন নাম দিয়েছেন এবং এটার বৈজ্ঞানিক নামও অনেক, তা সূর্যের চারপাশে চাপ সৃষ্টি করে এবং সূর্যের দেহ ভেদ করে জ্যোতির মূল অংশ চলে যায়। এই চাপ সূর্যের মধ্যে মহাকর্ষ বল সৃষ্টি করে এবং এই বল যা প্রায় ৮.৯x১০৪১ জুলস (joules) সূর্যকে চারপাশ থেকে সংকুচিত করতে চায়। সূর্যের বুকে পদার্থের সংকোচন শুরু হলে তার প্রভাবে তাপ উৎপন্ন হয় এবং তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটি ক্রান্তিক সীমা অতিক্রম করলে সেখানে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয় এবং সে বিক্রিয়ার বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি আলোক শক্তি হিসেবে বিকিরণ হতে থাকে যার পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ৩.৮৬x১০২৬ জুলস এবং সূর্য আমাদের কাছে উজ্জ্বল আলোকপিণ্ড হিসেবে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। আর এজন্য সূর্যকে প্রতি সেকেন্ডে খরচ করতে হয় ৪ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন। ক্রান্তিক সীমার নিচে ভরবিশিষ্ট বস্তুপিণ্ডে মহার্কষের চাপ এতবেশী নয়, তাই তাপমাত্রা এত বেশী হতে পারে না– তাই তারা আলো দেয় না।

পৃথিবী বা গ্রহ সরাসরি সূর্যের আলো ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারে না এবং সূর্যের আলো কিভাবে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে জীবজগতে খাদ্য বা জীবিকা সরবরাহ করে তা বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত আছে। কিন্তু সার্বিকভাবে সূর্যের

সমস্ত শক্তির উৎস হলো তার উপর বাইরে থেকে আরোপিত অন্য প্রকার শক্তি যাকে আমরা সনাক্ত করেছি আল্লাহর জ্যোতি হিসেবে।

সূর্যের আলো দেবার যে প্রক্রিয়া আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম তার সাথে কোনো পদার্থ বিজ্ঞানী দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন না কারণ এগুলো তাদেরই বর্ণনা, শুধু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের থেকে আলাদা। সূর্যের মধ্যে অবিরাম ও নিয়ন্ত্রিতভাবে সংঘটিত পারমাণবিক বিক্রিয়ার জন্য দায়ী সূর্যের মহাকর্ষ শক্তি যা তার নিজস্ব নয় বরং বাইরে থেকে আরোপিত এবং স্থানীয়ভাবে কোনো না কোনো কারণে সূর্যের মহাকর্ষ শক্তি কমবেশী হলে তা তার পারমাণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলোক শক্তি উৎপাদন ও বিকিরণকে প্রভাবিত করবে এবং সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির পরিমাণ একটি ক্রান্তিক সীমার নিচে চলে গেলে সূর্যের অভ্যন্তরে পদার্থিক চাপ কমবে এবং তাপও কমে আসবে এবং তার সুনিয়ন্ত্রিত অবিরাম পারমাণবিক বিক্রিয়া ব্যাহত হবে। সূর্য আর আলোক বিতরণ করবে না। আর সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির পরিমাণ নির্ভর করছে তার চারপাশ থেকে প্রযুক্ত বহিঃশক্তি যার বিভিন্ন নাম আগে উল্লেখ করেছি এবং চরমভাবে যার মূল উৎস আল্লাহ তায়ালার উপমিত ভাষায় বর্ণিত প্রদীপের জ্যোতি।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বের জন্য চারটি মৌলিক শক্তি সনাক্ত করেছেন : বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি, দুর্বল পারমাণবিক শক্তি, শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি ও মহাকর্ষ শক্তি। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য এবং চতুর্থটি পদার্থের বহির্ভূত শক্তি। প্রথম তিনটিকে দূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা একটি শক্তির বিভিন্নরূপ হিসেবে প্রমাণ করার আশা রাখেন কিন্তু চতুর্থটির সাথে একত্রীভূত করার স্বপ্ন সুদূর পরাহত। কারণ চতুর্থটির বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীদের দূরকল্পনেরও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে এবং ভুলক্রমে এটাকে পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বলে ভাবছেন যা ইতোমধ্যেই আমরা প্রমাণ করেছি পদার্থ বহির্ভূত শক্তি বলে।

আরেকটি বিশ্বজাগতিক শক্তি বিজ্ঞানীদের হিসাব নিকাশের বাইরে রয়ে গেছে, সেটা হলো গতি জড়তার শক্তি এবং এটার উৎসও পদার্থ বহির্ভূত। এটা হলো পদার্থিক জগতের পঞ্চম শক্তি। মহাকর্ষ বলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে তার গতিবেগ প্রায় অসীম এবং তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর। অনেক বিজ্ঞানীর মতে আলোর চেয়ে বিলিয়ন কিংবা ট্রিলিয়ন গুণ বেশী বেগে গতিশীল। বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাকর্ষ বলের এই বৈশিষ্ট্য না হলে গ্রহ নক্ষত্রের পরিভ্রমণের কক্ষপথ স্থায়ী ও স্থিতিশীল থাকবে না এবং সবাই অস্থিরভাবে বিক্ষিপ্ত পথে ঘুরে বেড়াবে।

আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরলোক তথা বিশ্বলোকের যেসব বৈজ্ঞানিক কার্য পদ্ধতির চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে সূর্য যে আরো কয়েকশত কোটি

বছর আলো দেবে তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই, তা কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় মানুষ তথা জীবজগৎ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও। বিজ্ঞানীদের এ সন্দেহাতীত ধারণা শুধু কল্পনামাত্র এবং যৌক্তিকভাবে অসংগতিপূর্ণ। এমনকি কয়েক শত কোটি বছর পর সূর্যের কিংবা অন্যান্য নক্ষত্রের আলো শেষ হয়ে গেলেও তা বামন নক্ষত্র হয়ে আরো বিলিয়ন বছর অস্তিত্বশীল থাকবে এবং এর পর কৃষ্ণবিবর হয়ে আরো ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর টিকে থাকবে এবং এরপরও হকিং রেডিয়েশন চলতে থাকবে আরো সুদীর্ঘকাল।

এরকম ধ্বংসমুখী বিশ্বের প্রায় অনন্তকালীন প্রতিচ্ছবি আঁকছেন বিজ্ঞানীরা এবং বিশ্ব সৃষ্টি করার পর এটা সৃষ্টিকর্তার হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং তিনি এটা ধ্বংস করতে চাইলেও তাকে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সূত্রের অধীনে ধ্বংস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এখন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর অপেক্ষায় থাকতে হবে এবং বিজ্ঞানীদের মতে এর বিকল্প কোনো উপায় নেই। আর এসবের অন্যতম মূল কারণ বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষ শক্তির উৎস সম্বন্ধে বিভ্রান্ত এবং এটাকে পদার্থের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করে তারা গণিতের হিসাব নিকাশ করছেন। বস্তুত গাণিতিক সত্য কখনো বৈজ্ঞানিক সত্য হতে পারে না, বৈজ্ঞানিক সত্য দার্শনিক সত্য হতে পারে না, দার্শনিক সত্য কখনও চিরন্তন বিধানের মতো সত্য হতে পারে না। এটা হলো সসীমতার সাথে বোধগম্যহীন অসীমতার সম্পৃক্তকরণের ভয়াবহ পরিণতি।

কিন্তু আমরা প্রমাণ করব বিশ্ব ধ্বংস করা কিংবা সংরক্ষণ করা আল্লাহ তায়ালার জন্য কত সহজ এবং কিভাবে তাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন এবং এ প্রসঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সব সূত্রাবলি কত ভঙ্গুর। এজন্য আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে পূর্বে বর্ণিত মহাকর্ষ তত্ত্বের সাথে জড়িত দু'টি অজ্ঞাত শক্তির দ্বিতীয়টি, যার নাম গতিজড়তা। কারণ প্রথমটি অর্থাৎ মহাকর্ষ শক্তির উৎস আমরা ইতিমধ্যে খুঁজে পেয়েছি।

নিউটনীয় মহাকর্ষ সূত্রের বিকল্প ও গ্রহণযোগ্য যুক্তিযুক্ত যে প্রস্তাব নিকোলাস ফেটিও উপস্থাপন করেছিলেন এবং যাকে ও যার পরিবর্ধিত বিভিন্ন রূপকে বিগত তিন শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের মূল ধারার অনুসারীরা যে কারণে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে তারা সবাই কি রকম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। সম্ভবত ফেটিওর নিজেরও দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং কোনো গবেষকও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তলিয়ে দেখেননি। এমনকি বর্তমানে জীবিত যেসব বিজ্ঞানী এটার সমর্থক এবং এ নিয়ে গবেষণা করছেন তারা কেবল

মহাকর্ষ সূত্র নিয়েই ব্যস্ত আছেন, নিউটনের গতিসূত্রসহ ব্যাপক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনেননি। সম্ভবত নিউটনের গতিসূত্রের প্রতি বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের অকুণ্ঠ অন্ধবিশ্বাস যা সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি মূর্খলোকদের অন্ধবিশ্বাসকেও হার মানায়, এজন্য তা দায়ী। এ তত্ত্ব এবং বর্তমানে বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিবর্ধিত এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে মূল আপত্তি হলো এতে পদার্থে বিপুল পরিমাণ শক্তি যোগ হয় এবং তাকে সব বিজ্ঞানীরা কেবল তাপীয় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যা পদার্থকে উত্তপ্ত করে কিন্তু বাস্তবে পদার্থ (উদাহরণস্বরূপ চন্দ্র কিংবা পৃথিবী) সে পরিমাণে উত্তপ্ত নয় এবং এ শক্তিকে তারা কোনোভাবে হিসাবে মিলাতে পারছেন না।

কিন্তু এ শক্তিকে কেবল তাপীয় শক্তি বিবেচনা না করে অন্য প্রকৃতির শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে বিজ্ঞানীদের অসুবিধা কোথায়, বিশেষত: গতি শক্তি হিসেবে? এমতাবস্থায় আমরা একটি অভিনব ও বাস্তব প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই যা কোনো জ্ঞানী বিজ্ঞানী যৌক্তিকভাবে অস্বীকার করতে পারবেন না বলে আমাদের বিশ্বাস। আর তা হলো চন্দ্র কিংবা পৃথিবী অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রসহ বিশ্বের সব পদার্থ ঐ শক্তিকে– যা বস্তুত গতিশক্তি হিসেবে পদার্থে সম্পৃক্ত হয়, তা পদার্থ গতিশক্তি হিসেবেই ব্যবহার করে, যাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন গতি জড়তা এবং এ গতি শক্তি থেকেই পদার্থের ভরকেন্দ্রে যে বলের ভারসাম্যতাহীনতা সৃষ্টি হয় তার ফলে পদার্থ আপন অক্ষে আবর্তন করে এবং গতিশীল হয়। এটা গ্রহ উপগ্রহ উল্কাপিণ্ড নক্ষত্রের বেলায় যেমন সত্য তেমনি ইলেকট্রন, প্রোটন এমনকি ফোটনের বেলায়ও সত্য। কারণ গতি জড়তার শক্তির পরিমাণ নগণ্য নয় এবং পৃথিবীর নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণের গতিশক্তি ২.৭X১০^{৩৩} জুলস যা তার মহাকর্ষীয় বন্ধন শক্তির (২.৪X১০^{৩২} জুলস) চেয়েও বেশী।

তাছাড়া সৌরলোকে পৃথিবীর গতিবেগ ৩০ কি./সে. হলেও মিল্কওয়ে গ্যালাক্সীর ক্ষেত্রে এটার গতি ২২০কি./সে. এবং ভিরগো সুপারক্লাস্টারের ক্ষেত্রে এটার গতি ৬০০কি./সে.। বস্তুত নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের গতি জড়তা মিথ্যা, অর্থাৎ শক্তি ছাড়া কোনো পদার্থ গতিশীল থাকতে পারে না এবং পদার্থ অবিরাম তার চারপাশ থেকে আল্লাহর জ্যোতির উপজাত শক্তি থেকে গতিশক্তি লাভ করে এবং এ শক্তি গ্রহণ পদার্থের আকার ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

নিউটন যেমন স্বীকার করেছেন অচেতন জড়পদার্থে এমন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না যে কোনো প্রকার মাধ্যম বা আন্ত:সংযোগ বাদে একে অপরকে আকর্ষণ করতে পারে, তেমনি তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করতে বাধ্য সেই অচেতন জড় পদার্থে অকারণিকভাবে এমন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না যে শক্তি বাদে সে সরলপথে চলতে

থাকবে। স্থানের কাঠামো অবিরামভাবে সবদিকে সমানভাবে অতিদ্রুতবেগে গতিশীল আল্লাহর জ্যোতির শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং এ শক্তিই পদার্থের অস্তিত্ব ও গতির মূল কারণ এবং স্থান শক্তিবিহীন হলে গতি অসম্ভব এবং পদার্থ সৃষ্টি ও ধারণ অসম্ভব। এটাই হলো স্থান, কাল, গতির মূল প্রকৃতি ও পদার্থের সাথে তাদের সম্পর্ক যা হাজার বছর ধরে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা অন্বেষণ করছেন। এটা হলো বিজ্ঞানীদের সবকিছুর তত্ত্ব (TOE- Theory of everything) ও মহা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব (GUT- Grand unified theory)।

পদার্থে অকারণিকভাবে কোনো শক্তি ছাড়া গতিশীলতা আরোপের চেয়ে শক্তি প্রয়োগের মাধমে গতিশীলতা লাভ যৌক্তিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বেশী গ্রহণযোগ্য। আর স্থানের এ শক্তির কারণেই গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কাপিণ্ড, কমেট, নক্ষত্রসহ বিশ্বের সব বস্তুই গতিশীল। এমনকি অণু, পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটনসহ সব মৌল কণিকা– এমনকি আলোর কণা ফোটনও গতিশীল। শক্তি ছাড়া বিশ্বের কোনো কিছু গতিশীল থাকতে পারে না, সব স্থির হয়ে পড়বে এবং ঠিক এই কারণে দৃশ্যমান আলো পর্যন্ত চরম হিমাংক তাপমাত্রায় গতিহীন স্থির হয়ে পড়ে কারণ তাকে গতিশীল রাখার মতো কোনো শক্তি তখন তার থাকে না কিংবা বাইরের কোনো উৎস থেকেও লাভ করে না।

এখন আমরা গ্রহ নক্ষত্র পরিভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় দু'টি শক্তির উৎসের সন্ধান পেলাম যা নিউটনের গতিসূত্র ও মহাকর্ষ সূত্রে ছিলো অজ্ঞাত। আপেক্ষিক কিংবা কোয়ান্টাম তত্ত্বেও অজ্ঞাত, এমনকি কোয়ান্টাম মহাকর্ষেও অজ্ঞাত এবং এ দু'টি শক্তি আবার চরমভাবে আল্লাহ তায়ালার জ্যোতি বা তার উপজাত শক্তি থেকে নির্গত। এখন দু'টি জ্ঞাত শক্তির সংযোগের ফলাফল হিসেবে কি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় আমরা সেদিকে নজর দেব। আপাততঃ আমরা পৃথিবী ও সূর্যে এ দু'টি শক্তি সংযোগের ফলাফল দেখব।

সৌরজগতের যে স্থানিক কাঠামো তার সবদিক জুড়ে আল্লাহর জ্যোতির উপজাত শক্তিতে পূর্ণ এবং এটাই হলো স্থানের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যা হাজার বছর ধরে দার্শনিকরা অন্বেষণ করছিলেন এবং আল্লাহর জ্যোতি প্রবাহ ব্যতিত স্থানের কোনো অস্তিত্ব নেই। স্থানের কাঠামো থেকে পৃথিবী কোনো কারণে বেশী শক্তি লাভ করলে তার গতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সে সৌরজগৎ থেকে ছিটকে বেড়িয়ে পড়বে। কম শক্তি লাভ করলে তার গতি শক্তি কমে যাবে। সে সূর্যের মহাকর্ষের টানে তার মধ্যে পড়ে যাবে এবং মোটেই না পেলে এবং সূর্যের মহাকর্ষ অকার্যকর হলে ও গতিজড়তা না থাকলে পৃথিবী স্থির হয়ে যাবে। আর সূর্যের ক্ষেত্রে আপাতত তার

গতিশীলতার বিষয়টি পরিহার করে আমরা বলতে পারি, কোনো কারণে সৌরলোকের স্থানিক কাঠামো থেকে মহাকর্ষীয় শক্তি বেশী পেলে সে বেশী আলো দেবে এবং কম পেলে কম আলো দেবে এবং মোটেই না পেলে সে আলো দেবে না।

এখন সূর্যের গতির বিষয় বিবেচনা করা যাক।

সূর্য বেশী শক্তি পেলে তার গতি বৃদ্ধি পাবে এবং কম পেলে তার গতি কম হবে এবং মোটেই শক্তি না পেলে সূর্য সম্পূর্ণভাবে গতিহীন হয়ে পড়বে। অর্থাৎ সৌরলোকের স্থানিক কাঠামোতে আল্লাহর জ্যোতি থেকে প্রবাহ শক্তি কোনো কারণে না থাকলে বা বন্ধ হয়ে গেলে মহাকর্ষ শক্তি এবং গতি জড়তার শক্তি দু'টোই একসাথে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সূর্যসহ সব গ্রহ উপগ্রহ স্থির হয়ে পড়বে, কারো কোনো গতি থাকবে না এবং একই কারণে সৌরলোকের ফোটনসহ সব অণু পরমাণুও গতিহীন হয়ে পড়বে এবং সূর্য তখন আলোহীন। আর তখন পদার্থের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানীদের বর্ণিত তিনটি মৌলিক শক্তির প্রভাবে পদার্থ কতক্ষণ অস্তিত্বশীল থাকবে সেটা বিজ্ঞানীরা এবং গণিতবিদেরা তাদের গণিতের হিসাব করে দেখার অনুরোধ রইল। এমতাবস্থায় তারা দেখবেন পদার্থিক বিশ্ব সমস্ত অণু পরমাণুসহ অস্তিত্ব হারিয়ে স্থানিক কাঠামোতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং স্থানও শক্তি হারিয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞদের জন্য এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ।

অতএব আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পাচ্ছি সৌরলোক তথা বিশ্বলোক আল্লাহ তায়ালার জ্যোতি লাভ ব্যতিত অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। আর বিশ্ব কতক্ষণ অস্তিত্বশীল থাকবে তা নির্ভর করছে তার উপমিত ভাষায় বর্ণিত পূতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়ে যতক্ষণ তিনি জ্যোতি বিতরণ করে স্থানিক কাঠামোতে শক্তি প্রবাহ অব্যাহতভাবে রাখবেন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রসমূহের স্থানিক কাঠামো শক্তি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে কার্যকর থাকতে পারে না। কিন্তু স্থানিক কাঠামোর শক্তি প্রবাহ নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে তার পবিত্র ইচ্ছার উপর। তাই বিশ্বজগৎ তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এবং তাঁর প্রতিপালন ব্যতিত বিশ্ব এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারবে না। এটা নাস্তিকপ্রবণ বিজ্ঞানীদের বোধগম্য হোক কিংবা না হোক তাতে এ মহাসত্যের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। আর ঠিক এ কারণে আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের প্রতিপালক, রাব্বুল আলামিন।

জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে বিশ্বজগতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে জ্যোতি জ্বালিয়ে রেখেছেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা আরবীতে হলো 'নূরুন 'আলা নূর' বাংলায় 'জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি', ইংরেজীতে 'Light upon light'। অর্থাৎ আলোর অনেক স্তর আছে এবং বিভিন্ন স্তরের আলোতে গুণ ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আছে। আল্লাহ তায়ালার যে জ্যোতি সারা বিশ্ব জুড়ে পরিব্যাপ্ত আর সূর্য বা নক্ষত্র যে আলো বিতরণ করে তা এক প্রকৃতির নয় : দ্বিতীয়টি হলো প্রথমটির উপজাত। এ সম্বন্ধে আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব এবং তা থেকে আমাদের জন্য যতদূর সম্ভব বোধগম্য তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করব যা আমাদেরকে বিশ্বজগৎ পরিচালনায় তার অপূর্ব নিদর্শনসমূহ বুঝতে সহায়ক হবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আলোকে কণা ও তরঙ্গ এই দ্বৈত সত্তা রূপে বর্ণনা করা হয় এবং আলোর মৌলিক এককের নাম দেয়া হয়েছে ফোটন। মহাবিশ্ব ও তার কার্য প্রক্রিয়ার বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য ফোটনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অতীব প্রয়োজন; কারণ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চারটিই স্থূল তারা আমাদের চারপাশে বেশী দূরে কাজ করে না এবং দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত যে ইন্দ্রিয় কাজ করে তার সাথে সম্পর্কিত বিষয় হলো ফোটন। তাই ফোটন সম্বন্ধে ধারণায় বিভ্রান্তি থাকলে জগৎ সমন্ধে আমাদের জ্ঞানে বিভ্রান্তি আসতে বাধ্য। ফোটন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখনো পরিপূর্ণ নয়, তবু তাদের বিভিন্ন তথ্য থেকে যা পাওয়া যায় তা দিয়েই আমরা অগ্রসর হব।

বিশ্বজগতের যাবতীয় কার্যক্রম চলছে পদার্থ ও শক্তির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সম্পর্কের সমন্বয়ের ফলাফল হিসেবে। তবে এ দু'টোর মধ্যে পদার্থ দৃশ্যমান কিন্তু শক্তি দৃশ্যমান নয়, শক্তি পদার্থের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ শক্তির সরাসরি প্রকাশ আমাদের জন্য কিংবা বিজ্ঞানীদের জন্যও বোধগম্য নয়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ শক্তি মানুষের বোধগম্যের অতীত, যে শক্তি কোনো না কোনোভাবে অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম প্রকারে হলেও পদার্থের সাথে সম্পর্কিত কেবল সেটাই মানুষের জন্য বোধগম্য, এটাকে বলা যায় ভৌত শক্তি।

তাই শক্তিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায় : বিশুদ্ধ শক্তি ও ভৌত শক্তি। চারপাশে যদি অপরিসীম শক্তি প্রবাহিত থাকে কিন্তু পদার্থিক কাজের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত

নয়, তবে সে ব্যাপারে কোনো বৈজ্ঞানিক বক্তব্য থাকতে পারে না এবং তা নিয়ে বিজ্ঞানের স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতিতে কিছু যায় আসে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার এ সীমাবদ্ধতা অবশ্যই তাদের স্বীকার করতে হবে।

অসীম শক্তির যেটুকু মাত্র পদার্থে সম্পৃক্ত কেবল সেটুকুই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র এবং এ ক্ষেত্রের বাইরে স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে সার্বিক বিশ্বজনীন বক্তব্য দেবার অধিকার বিজ্ঞানের নেই। আমাদের বক্তব্য তাই কেবল ভৌত শক্তি নিয়ে এবং ফোটনকে বিবেচনা করব ভৌত শক্তির বাহক হিসেবে। ভৌত শক্তিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : সৃজনশীল নূর (Primary creative light), গৌণ আলো (secondary light)। স্থানিক কাঠামো বা ইথারে বা বৈজ্ঞানিক ভাষায় জিরো পয়েন্ট রেডিয়েশন হলো সৃজনশীল নূর এবং সূর্য বা নক্ষত্র বা নীহারিকাসহ দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সব আলো হলো গৌণ আলো।

পরবর্তীতে আমরা যখনই শক্তির কথা বলব বুঝতে হবে আমরা ভৌত শক্তির কথা বলছি।

আর পদার্থ বলতে স্থূল পদার্থসহ অণু পরমাণুকে বুঝায়। ফোটন হলো শক্তির বাহক এবং তথ্যেরও বাহক এবং ফোটনের এই অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য ছাড়া বিশ্ব জগৎ সমন্ধে মানুষের পক্ষে কোনো জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। কিন্তু ফোটন কিভাবে শক্তি ও তথ্য বহন করে সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো রহস্যময়, পুরো চিত্র স্পষ্ট নয়, বিশেষত বিপুল দূরত্বে শক্তি ও তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এ দু'টো প্রায় অক্ষত থেকে যায়। প্রফেসর কানারভের মতে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় সূত্রাবলি এ বিষয়ে কোনো তথ্য প্রদানে ব্যর্থ কিন্তু এটার উত্তর আমরা একটু পরেই খুঁজে পাব। আলোর শক্তি ও তথ্য বহন অক্ষত থাকার কারণেই টেলি যোগাযোগ, রেডিও-টিভি-কম্পিউটার, স্যাটেলাইট সংযোগ এমনকি গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সী নীহারিকাসহ মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়েছে।

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ প্রকাশের পর থেকেই আলোককে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু গত এক শতাব্দীতে এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিতর্ক শেষ হয়নি। প্রকৃত বিশ্লেষণে দেখা যায় ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ আলোক প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত করে না বরং স্থানে ইথারিক শক্তির চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে গাণিতিকভাবে চিহ্নিত করে মাত্র।

বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের তরঙ্গকে আলোর তরঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয় কিন্তু চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের তরঙ্গের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না। কিন্তু আমাদের গবেষণা মতে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিমাপণে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ভূমিকা

গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ স্থান বা ইথারের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রই হলো আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নিয়ামক। বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি মূল হিসেবে পরিচিত ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় সমীকরণগুলো বাস্তব পদার্থ জগতের প্রতি গাণিতিক অবাস্তব বোধগম্যহীন প্রহসন মাত্র (Deeper hidden message in Maxwell's Equation : Ivor Catt)।

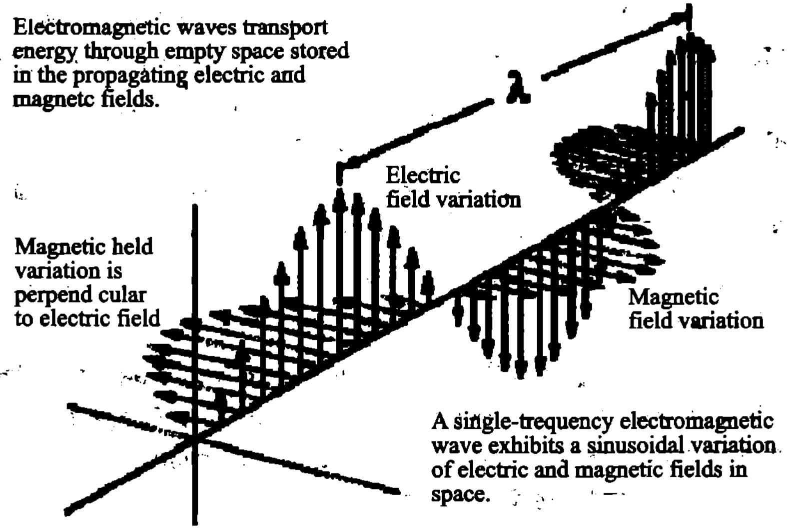

তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান বিশেষত আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম বিজ্ঞান ফোটনকে ভরশূন্য হিসেবে গ্রহণ করলেও নিরীক্ষাধর্মী পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ তথ্য হলো ফোটন ভরবিশিষ্ট এবং বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন ফোটনের ভর বিভিন্ন অর্থাৎ ফোটনের শক্তি যতবেশী তার ভরও ততবেশী। ফোটনের শক্তির মাত্রা অতি নিম্নস্তর থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে অতি উচ্চস্তর পর্যন্ত বর্ধিত তাই ফোটনের ভরও অতি নিম্নস্তর থেকে শুরু করে অতি উচ্চমাত্রা পর্যন্ত বর্ধিত কিন্তু এই নিম্ন ও উচ্চ সীমা এখনো সঠিকভাবে বিজ্ঞানীরা নির্ধারিত করতে পারেননি।

এদিকে ফোটনের শক্তির মাত্রা তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রফেসর কানারভের গবেষণা অনুসারে ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই হলো তার ব্যাসার্ধ অর্থাৎ তরঙ্গ ও কণা এই দ্বৈত সত্তার ফোটনে যেটা তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটাই তার কণা রূপী সত্তার ব্যাসার্ধ। অর্থাৎ ফোটন আপন অক্ষে আবর্তনকালে তার ব্যাসার্ধই তরঙ্গরূপী বৈশিষ্ট্যে দৃশ্যমান হয়। আমরা মনে করি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং এটা স্থানের বিরামহীনতার বিপরীতে বিভক্তিকরণের (Discrete

space) ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার লক্ষ দেবার ধারণাকে রহিত করে। তাই যখনই কোনো ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বলা হয়, সাথে সাথে আমরা সে ফোটনের আকার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। মানুষের চোখ যে সব ফোটনকে ধারণ করতে পারে তা নিম্ন শক্তি সম্পন্ন, তাই উচ্চ বা অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন শক্তির ফোটন মানুষের চোখের পর্দায় প্রতিবিম্বিত হয় না, ফলে তা আমাদের দৃশ্যমানতার আড়ালে থেকে যায় (মানুষের চোখের ধারণ ক্ষমতা মাত্র ৩০০ থেকে ৮০০ নানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটন কিন্তু অনেক জীবজন্তুর চোখের ধারণ ক্ষমতার সীমা বেশী)। ঠিক এ কারণে রাতের আকাশ আমাদের জন্য অন্ধকার অর্থাৎ তখন আকাশে যেসব ফোটন আছে তার তরঙ্গ আমাদের চোখে প্রতিবিম্বিত হয় না, তাই সেসব ফোটন আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয় না। বস্তুত মহাবিশ্বের এমন কোনো স্থান নেই যেখানে ফোটন নেই কিন্তু তা আমাদের দৃশ্যমানতার ক্ষমতার আড়ালে আছে। আলোর একটি সীমিত মাত্রা আমাদের জন্য দৃশ্যমান বিধায় আমরা কুরআনের এ কথার অর্থ বুঝতে পারি- "কোনো চোখ তাকে ধারণ করতে পারে না কিন্তু সব চোখকে তিনি ধারণ করেন"। বস্তুত কোনো স্থান কাল পাত্র তাকে ধারণ করতে পারে না।

এখন আমরা ফোটনের শক্তিমাত্রার কিছু পরিসংখ্যান দেব-

সাধারণ দৃশ্যমান আলো বা ফোটন ২ ইভি (ইলেকট্রনভোল্ট)।

এক্স-রে- ৫০,০০০ ইভি (Electron volt)

গামা-রে- ১,০০০,০০০ ইভি (ev)

মহাকাশে উচ্চশক্তি ফোটন $১০^{৯}$ ইভি (ev)

গবেষণাগারে তৈরী উচ্চ শক্তি ফোটন $১০^{১২}$ ইভি (ev)

বিজ্ঞানীরা আগে বিশ্বাস করতেন, প্রাকৃতিকভাবে ফোটনের উচ্চ শক্তি সীমা $১০^{১৫}$ ইভির বেশী হতে পারে না কারণ বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে তৈরী ফোটনের সর্বোচ্চ শক্তিসীমা $১০^{১২}$ ইভি (ev)। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে আরো উচ্চ শক্তির ফোটনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে যার পরিমাণ $১০^{১৯}$ ইভি। সাম্প্রতিক সময়ে আরো উচ্চশক্তির ফোটনের প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন যার পরিমাণ $১০^{২০}$ ইভি যা বিজ্ঞানীদেরকে হতবাক করে দিয়েছে এবং তার নাম তারা দিয়েছেন "ও মাই গড পার্টিকেল (O my God particle) কারণ এতবেশী শক্তির ফোটন দূর ভবিষ্যতে কোনো দিন বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে তৈরী করতে পারবেন বলে মনে করেন না। এতে কুরআনে বর্ণিত মূসা নবীর আল্লাহকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করা সহজ- মূসা নবী আল্লাহকে দর্শনের ইচ্ছা করলেন কিন্তু আল্লাহ বললেন তুর

পাহাড় যদি তার নূরকে সহ্য করতে পারে তবে তাকে দর্শন সম্ভব। কিন্তু তূর পাহাড় তার নূরের ঝলকে গুড়ো হয়ে গেল এবং বলা হয়ে থাকে আল্লাহর নূরকে সত্তরটি কিংবা সত্তর হাজার পর্দার আড়াল করে তূর পাহাড়ে ফেলা হয়েছিল।

মহাকাশে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ফোটনের সংখ্যা বেশী নয়–

$১০^{১২}$ ইভি শক্তির ফোটন প্রতি বর্গমিটার প্রতি সেকেন্ডে ১ টি।

$১০^{১৬}$ ইভি শক্তির ফোটন প্রতি বর্গমিটার প্রতি বছরে ১ টি।

$১০^{২০}$ ইভি শক্তির ফোটন প্রতি বর্গকিলোমিটার প্রতি শতাব্দীতে ১ টি।

মহাকাশে নভোবিজ্ঞানীরা আরেক ধরনের বিপুল শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন যা খুবই ক্ষণস্থায়ী কিন্তু শক্তির পরিমাণ অকল্পনীয় যার নাম গামা-রে বার্ষ্ট (Gamma ray burst)। এটার শক্তি এত বেশী যে, বলা হয় আমাদের সূর্য হাজার কোটি বছর জ্বলে যে আলো দেয় তা যদি একসাথে জ্বলে মাত্র ১০ সেকেন্ডে তার সবশক্তি শেষ করে– তবে সেটা হবে গামা রে বার্ষ্টের সমান। আর এ রকম ঘটনা সৌরজগতের একশত আলোকবর্ষ এলাকায় ঘটলে সৌরজগৎ সে তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। **শক্তির পরিমাপে এটা কমবেশী $১০^{৪৪}$ জুলস**। এটার প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পূর্ণ রহস্যময়। কিন্তু এটাকে সুউচ্চমাত্রার ফোটন বলেও অনেক বিজ্ঞানী দাবী করেন। এরকম ঘটনা মহাকাশে প্রতি লক্ষ আলোকবর্ষ বর্গ এলাকায় প্রতি মিলিয়ন বছরে একবার ঘটে বলে বিজ্ঞানী ধারণা করছেন। তবু নভোবিজ্ঞানীরা প্রায় প্রতিদিনই দূরবর্তী মহাকাশে এরকম ঘটনার তথ্য রেকর্ড করে চলেছেন (আল-কুরআনে সূরায় ত্বরিকে বর্ণিত হঠাৎ আগন্তুক রাতের দেদীপ্তমান নক্ষত্র ইংরেজীতে A star of piercing brightness সম্ভবতঃ এটাই)।

পদার্থ বিজ্ঞানকে এক শতাব্দী পিছিয়ে প্লাংক পূর্ব অবস্থায় নিয়ে গেলে বিষয়টি বোধগম্য হয়। **রেলিইগ-জিন্স সূত্র (Reyleigh-Jeans law) অনুসারে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে তার শক্তি ততবেশী হবে এবং এ তত্ত্বে একটি ভয়ংকর বিপর্যয়ের সম্ভাবনার আভাস ছিলো যার নাম অতিবেগুনী রশ্মি বিপর্যয় (Ultraviolet catastrophe)**। এ সূত্রকে সংশোধন করে ম্যাক্স প্লাংক আবিষ্কার করেন শক্তির ন্যূনতম একক যা আইনস্টাইন ও নিলস বোরের মাধ্যমে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা হিসেবে বিকশিত হয়ে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে সত্যি বিপর্যয় ডেকে আনে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিজ্ঞান যত সমস্যার সমাধান দিয়েছে তার চেয়ে শতগুণ বেশী জটিলতার জন্ম দিয়েছে। এ তত্ত্বে কোয়ান্টাম লম্ফের প্রবর্তন করে স্থান কালের অবিরাম প্রবাহে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে তার পরিণতি হলো– **কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের নিজেরই আত্মহত্যার অন্ধকূপ যার নাম দেয়া হয়েছে কলাপ্স অব ওয়েভ**

ফাংশন (Collapse of wave function), যার অর্থ করা যায় বুদ্ধিবৃত্তির বিধ্বস্তকরণ। আর এটা থেকে পরিত্রাণের যে অভিনব ব্যবস্থা আবিষ্কার করা হয়েছে তার নাম হলো রিনর্মালাইজেসন (Renormalization), যার সহজবোধ্য অর্থ হলো কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় অসীমের অন্ধকূপে ঝাঁপিয়ে পড়ার অস্বাভাবিক প্রবণতাকে রোধ করতে অসীম রাশিগুলো বাদ দিয়ে স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা।

কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে সীমিত বল কেন অসীমকে আলিঙ্গন করে বার বার সেদিকে ঝুঁকে পড়ে তার কোনো সদুত্তর নেই। হয় তাদের তত্ত্ব মিথ্যে, কিংবা তাদের গণিত মিথ্যে কিংবা উভয়েই মিথ্যে।

তাত্ত্বিকভাবে ও গাণিতিক হিসাবে সবচেয়ে নিম্নশক্তির বা দুর্বল ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় দৃশ্যমান জগতের সমান এবং তার শক্তি কমবেশী ১০$^{-৫৩}$ জুলস এবং ভর প্রায় ১০$^{-৬৫}$ গ্রাম এবং শক্তির সর্বোচ্চ মাত্রার ফোটন ১০^{৭০} জুলস (দৃশ্যমান বিশ্বের মোট শক্তি) এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০$^{-৯০}$ মিটার এবং ভর প্রায় ১০^{৫৫} কিলোগ্রাম (বিশ্বের সম্ভাব্য মোট ভর) কিংবা আরো বেশী। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ সৃষ্টির জন্য আল্লাহর অসীম নূরের একটি আলোর কণা যথেষ্ট।

ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে আসার সাথে সাথে তার ভর ও শক্তি কি রকম বৃদ্ধি পায় তার পরিসংখ্যানের কিছু তথ্য নিম্নরূপ–

Ranges	Wavelength, m	Mass, kg	Energy, eV
1. Low-frequency range	$\lambda \approx 3\cdot10^{8}...3\cdot10^{4}$	$m \approx 0.7\cdot10^{-50}...0.7\cdot10^{-46}$	$E \approx 4\cdot10^{-15}...4\cdot10^{-11}$
2. Broadcast range	$\lambda \approx 3\cdot10^{4}...3\cdot10^{-1}$	$m \approx 0.7\cdot10^{-46}...0.7\cdot10^{-41}$	$E \approx 4\cdot10^{-11}...4\cdot10^{-6}$
3. Microwave range	$\lambda \approx 3\cdot10^{-1}...3\cdot10^{-4}$	$m \approx 0.7\cdot10^{-41}...0.7\cdot10^{-38}$	$E \approx 4\cdot10^{-6}...4\cdot10^{-3}$
4. Relic range (max.)	$\lambda \approx 1\cdot10^{-3}$	$m \approx 2.2\cdot10^{-39}$	$E \approx 1.2\cdot10^{-3}$
5. Infrared range	$\lambda \approx 3\cdot10^{-4}...7.7\cdot10^{-7}$	$m \approx 0.7\cdot10^{-38}...0.3\cdot10^{-35}$	$E \approx 4\cdot10^{-3}...1.6\cdot10^{-3}$
6. Light range	$\lambda \approx 7.7\cdot10^{-7}...3.8\cdot10^{-7}$	$m \approx 0.3\cdot10^{-35}...0.6\cdot10^{-35}$	$E \approx 1.6\cdot10^{0}...3.27\cdot10^{0}$
7. Ultraviolet range	$\lambda \approx 3.8\cdot10^{-7}...3\cdot10^{-9}$	$m \approx 0.6\cdot10^{-35}...0.7\cdot10^{-33}$	$E \approx 3.27\cdot10^{-2}...4\cdot10^{2}$
8. Roentgen range	$\lambda \approx 3\cdot10^{-9}...3\cdot10^{-12}$	$m \approx 0.7\cdot10^{-33}...0.7\cdot10^{-30}$	$E \approx 4\cdot10^{2}...4\cdot10^{5}$
9. Gamma range	$\lambda \approx 3\cdot10^{-12}...3\cdot10^{-18}$	$m \approx 0.7\cdot10^{-30}...0.7\cdot10^{-24}$	$E \approx 4\cdot10^{5}...4\cdot10^{11}$

(কানারভের গ্রন্থ থেকে গৃহিত)

অধিকাংশ বিজ্ঞানী রিলিক থেকে শুরু করে গামা পর্যন্ত সীমাকে আলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলে গ্রহণ করার পক্ষপাতি এবং এটার নিম্ন ও উচ্চসীমাকে ফোটন বলে গ্রহণ করতে রাজী নন। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে এটার নিম্ন ও উচ্চসীমার তরঙ্গ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। **আমাদের ধারণা ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই যে কণারূপী আলোর ব্যাসার্ধ তা কেবল এই সীমার মধ্যে কার্যকর এবং নিম্নসীমায় এ তরঙ্গের গতিবেগ আলোর চেয়ে কমতে থাকে এবং উচ্চসীমায় এ তরঙ্গের গতিবেগ আলোর চেয়ে বেশী হতে থাকে।**

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হলে কেন ফোটনের শক্তি ও ভর বৃদ্ধি পায় তার যৌক্তিক কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু এটার উত্তর আমাদের কাছে আছে।

ফোটনের মূল শক্তি হলো বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি। ফোটন মূলতঃ একটি শক্তির আঁধার এবং আল্লাহর জ্যোতিজাত স্থানের শক্তি এই আঁধারে সঞ্চিত হলে তা বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়। বিশ্ব প্রতিপালক নামে আমাদের প্রথম নিবন্ধে আমরা প্রস্তাব এবং প্রমাণ করেছি পদার্থ বা অণু পরমাণু আল্লাহ তায়ালার জ্যোতির উপজাত শক্তি থেকে শক্তি পেয়ে থাকে এবং এ শক্তি গ্রহণের পরিমাণ তার আকার ও ঘনত্বের সমানুপাতিক। এটা ফোটনের ক্ষেত্রেও সত্য, তাই ফোটনের ঘনত্ব যতবেশী তার শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা ততবেশী। ফোটনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি তার ব্যাসার্ধ হয় তবে ব্যাসার্ধ যত কম ঘনত্ব ততবেশী এবং তার শক্তিও ততবেশী। আর ফোটন যতবেশী শক্তি লাভ করবে তার গতিবেগও ততবেশী বৃদ্ধি পাবে এবং ফোটনের সাধারণ গতিবেগকে অতিক্রম করবে। একইভাবে ফোটনের শক্তি ক্রান্তিক সীমার নিচে চলে গেলে তার গতিবেগ ফোটনের সাধারণ গতিবেগের নিচে চলে যাবে এবং একই কারণে ইলেকট্রন প্রোটনসহ সব পদার্থিক কণার গতিবেগ ফোটনের গতিবেগের চেয়ে কম। তাই ফোটনের গাঠনিক কাঠামোকে বিবেচনা করা যায় ভৌত শক্তির আঁধার হিসেবে এবং ফোটনের সাথে তাপের সম্পর্ক আছে, কিন্তু আল্লাহর জ্যোতির সাথে তাপের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ পদার্থের উপস্থিতি ব্যতিত তাপের ব্যাখ্যা অসম্ভব। আল্লাহর জ্যোতির বেগ সাধারণ ফোটনের চেয়ে ট্রিলিয়ন গুণেরও বেশী কিংবা প্রায় অসীম কিংবা তাৎক্ষণিক।

ফোটনের গতি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও স্পন্দনের সাথে সম্পর্কিত এবং দৃশ্যমান আলোকের যে গ্রাফ অধ্যাপক কানারভ অংকন করেছেন তাতে দেখা যায় আলোর

বিভিন্ন স্পন্দনের গতি বিভিন্ন এবং তাদের গড়মূল্য হলো বর্তমানে বিজ্ঞানীদের গৃহিত আলোর বেগ।

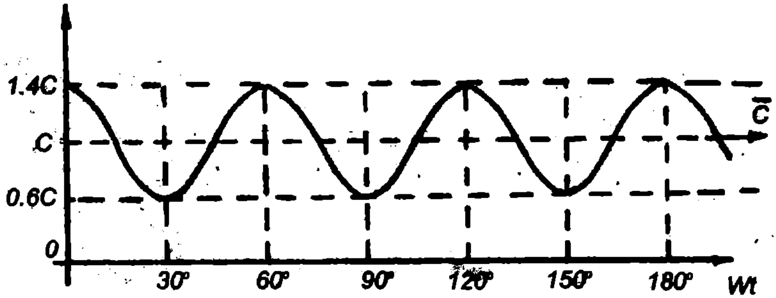

Diagram of velocity change of the centre of mass of the photon.

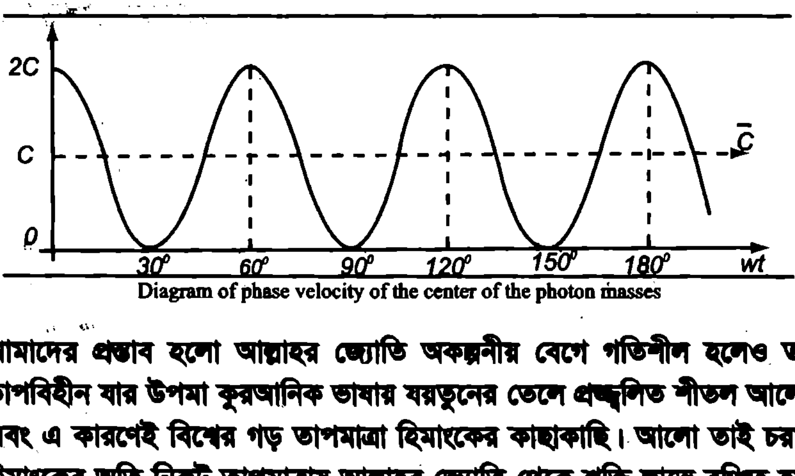

Diagram of phase velocity of the center of the photon masses

আমাদের প্রস্তাব হলো আল্লাহর জ্যোতি অকল্পনীয় বেগে গতিশীল হলেও তা তাপবিহীন যার উপমা কুরআনিক ভাষায় যয়তুনের তেলে প্রজ্জ্বলিত শীতল আলো এবং এ কারণেই বিশ্বের গড় তাপমাত্রা হিমাংকের কাছাকাছি। আলো তাই চরম হিমাংকের অতি নিকট তাপমাত্রায় আল্লাহর জ্যোতি থেকে শক্তি লাভে বঞ্চিত হয় এবং এমতাবস্থায় আলোর কাঠামো আল্লাহর জ্যোতি প্রবাহে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে পারে না, তাই তার গতি জড়তা প্রাপ্ত হয় না এবং তাই গতিহীন হয়ে পড়ে।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন বোস ম্যাক্স প্লাংকের গবেষণার পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রস্তাব করেন আলো চরম হিমাংকে গতিহীন হয়ে পড়বে (আইনস্টাইনের কল্যাণে বিশ্বে এটা বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব নামে পরিচিত) যা শতাব্দী শেষে উরিক করনেল ও কার্ল উইম্যান প্রমাণ করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৭০ নানো কেলভিন তাপমাত্রায় গতিহীন আলোর দৃশ্য নিম্নরূপ–

Bose- Einstein condensate. Center : Just after the appearance of the condensate. Right: after further evaporation, leaing a sample of nearl pure condensate.

এদিকে প্রফেসর কানারভ নিজেই আশ্চর্যবোধ করেন সাধারণ শক্তি সম্পন্ন আলো গড় গতিবেগে চললেও একটি দুর্বল শক্তি সম্পন্ন ফোটন যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি সৌরজগতের সমান হয় তাহলে কি করে সে আলোর গড় গতিবেগে চলতে পারবে? **আমরা তার বক্তব্যের রেশ ধরে বলতে চাই– একইভাবে অতি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন আলোর কি করে গড় গতিবেগ সীমিত থাকবে? আর যেসব বিজ্ঞানী আলোর গতিবেগের সীমা অতিক্রম করার দাবী করেছেন সেসব আলোই উচ্চশক্তি সম্পন্ন যেমন চেরেনকভ বিকিরণ।**

তাছাড়া সাধারণত আলোর গতি সংক্রান্ত যেসব পরীক্ষা করা হয় তা সবই পৃথিবী কেন্দ্রীক এবং আলোর মূল বৈশিষ্ট্য বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি সম্পন্ন এবং আমাদের পৃথিবী নিজেই বিপুলাকার চৌম্বক ক্ষেত্র বিধায় এটা আলোর গতিকে প্রভাবিত করে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলাফল প্রায় একই হয় যা বিজ্ঞানীদের জন্য আলোর প্রকৃত গতি পরিমাপের বিশেষ অন্তরায়। **তাই পৃথিবীতে আলোর যে গতি তা সারা বিশ্বের জন্য ধ্রুবক হতে পারে না এবং পৃথিবীর বা যে কোনো গ্রহ নক্ষত্রের চৌম্বক ক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে আলোর গতি পরিমাপের প্রযুক্তি এখনো বিজ্ঞানীরা অর্জন করেননি।**

তাছাড়া প্রফেসর কানারভ ফোটনের যে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তির গাণিতিক ডায়াগ্রাম অংকন করেছেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন– ফোটনের পরিধির এলাকার শক্তির মোট পরিমাণ ফোটনের কেন্দ্রীয় ভরের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং এ

ভারসাম্যহীনতাই তার অবিরাম গতির কারণ। তার এ বক্তব্যের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি ফোটনের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী শক্তি যখন একটি ক্রান্তিক সীমা অতিক্রম করবে তখন অবশ্যই ফোটনের গতিবেগ তার স্বাভাবিক মাত্রাকে অতিক্রম করবে।

এদিকে আলো কোনো মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে কিনা তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে আলোকের বাহক হিসেবে প্রথমে ইথারের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও শেষে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে স্বীকার করতে বাধ্য হন। তা ছাড়া বর্তমান বিজ্ঞানে এটার নাম ব্যবহার করা না হলেও একই বৈশিষ্ট্যের সত্তাকে অন্য নামে ডাকা হয় এবং সবচেয়ে বেশী পরিচিত শব্দ হলো স্থান-কাল। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকভাবে স্থান-কাল বলতে যা বুঝানো হয় ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটাই হলো আল্লাহর জ্যোতিপূর্ণ অবস্থা অর্থাৎ কোনো বিন্দুতে যদি এ জ্যোতি না থাকে তবে স্থান-কালও নেই এবং তেমন কোনো অবস্থায় গতি অসম্ভব এবং এটা ফোটনের জন্যও সত্য। তাই আলোর সাধারণ গতিবেগ ৩০০,০০০ কিলোমিটার/সেকেন্ড হলেও যখন সে আল্লাহর জ্যোতিপূর্ণ স্থানিক কাঠামো থেকে শক্তি লাভে বঞ্চিত হবে তখন তার কোনো গতি থাকবে না। আমরা দেখেছি সাধারণ দৃশ্যমান আলোর শক্তি মাত্র ২ ইভি, কিন্তু এটুকু শক্তি দিয়ে আলো মিলিয়ন মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব অতিক্রম করে এবং তার শক্তি অক্ষত থাকে, তার বাইরে থেকে শক্তি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এটা কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক সত্য হতে পারে- সে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা এড়িয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে বিভাস দে একটি বাস্তবমুখী তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন যা ইথারের সাথে সম্পৃক্ত এবং যার নাম দিয়েছেন উৎসবিহীন চৌম্বকীয় ক্ষেত্র (Source-free magnetic structures)।

আমাদের দৃষ্টিতে এটা পদার্থের প্রকৃত বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

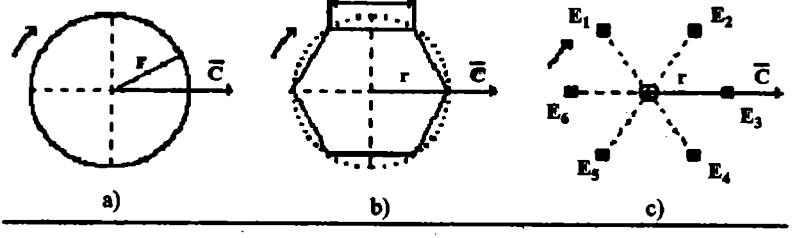

To photon structure revelation

ফোটনের গাঠনিক কাঠামোর চিত্রে দেখা যায় এটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই হল তার ব্যাসার্ধ এবং এটা একটি চৌম্বকদণ্ড হিসেবে কাজ করে। ফলে ফোটনের কাঠামোতে ছয়টি চৌম্বকদণ্ড পরস্পর যুক্ত এবং ফোটন যখন আবর্তন করে তখন এটা ক্ষুদ্র জেনারেটরের (Micro generator) মতো কাজ করে এবং তার প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রনের কাঠামোর অভ্যন্তরেও একইভাবে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং বাহ্যতঃ এ কারণেই ফোটন ও ইলেকট্রনের শক্তি অক্ষত মনে হয়।

উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফোটন থেকে অনেক সময় পদার্থ শক্তি গ্রহণ করে এবং ফোটনের শক্তি কমে আসে কিন্তু ফোটন কখনো অন্য কোনো উৎস থেকে কিংবা অন্য কোনো ফোটন থেকে শক্তি যোগ করতে পারে না। অনেকে ফোটনের এ বৈশিষ্ট্যকে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের এনট্রপির সাথে সম্পর্কিত বলে ধারণা করেন এবং সময়ান্তরে এনট্রপি বৃদ্ধির সাথে সাথে ফোটনের ধারণকৃত শক্তি কমে আসবে এবং তার গতিবেগও কমে আসবে। ফোটনের শক্তিক্ষয়ের সাথে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় যার ফলে লোহিত বিচ্যুতি ঘটে, যাকে আবার কিছু বিজ্ঞানী ভুল করে সম্প্রসারণশীল বিশ্বের প্রস্তাব করেছেন।

ফোটনের এ শক্তিক্ষয়কে তার গতিবেগের সাথেও সম্পর্কিত বিবেচনা করে অনেকে সময়ান্তরে আলোর গতি হ্রাস পাবার দাবী করেন এবং তাদের হিসাবে আলোর বেগ প্রতি মিলিয়ন বছরে কমবেশী ১২০ কিলোমিটার/সেকেন্ড কমে আসে বলে দাবী করছেন। সে হিসাবে অতীতে কিংবা বিশ্ব সৃষ্ট মুহূর্তে আলোর গতিবেগ বর্তমান গতির চেয়ে বেশী ছিলো। অনেকে এ হার আরো বেশী বলে প্রমাণ করেছেন। এরকম হলে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী, সূর্য বা নক্ষত্র বা বিশ্বের যে বয়স নির্ধারণ করেছেন তা আরো কম হবে বলে অনেকে দাবী করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা সব সময় পদার্থ বিজ্ঞানীদের চাপের মুখে রেখেছেন বিশ্বের বয়স সুদীর্ঘকালের প্রক্রিয়া বলে হিসাব করতে অন্যথায় তাদের তথাকথিত জীব জগতের বিবর্তনের হিসাবের সাথে গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পারমাণবিক বিক্রিয়া আবিষ্কারের পূর্বে পদার্থ বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন সূর্যের মোট মহাকর্ষ শক্তিই তার আলোকশক্তি বিকিরণের মূল উৎস এবং সে হিসেবে সূর্যের বয়স কয়েক মিলিয়ন বছর মাত্র। কিন্তু বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা এটা মেনে নিতে পারলেন না কারণ তাহলে তাদের বিবর্তন তত্ত্ব মিথ্যে হয়ে যাবে। পরিশেষে পারমাণবিক বিক্রিয়া আবিষ্কারের পর পদার্থ বিজ্ঞানীরা সূর্যের বয়স মিলিয়ন থেকে বিলিয়নে বাড়িয়ে দিলেন এবং বিবর্তনবাদীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাই বিষয়টি স্পর্শকাতর ও বস্তুনিষ্ঠ নয়।

পুনরায় স্মরণীয় যে বিশ্বের বয়স, আকার ইত্যাদির সঠিক জ্ঞান নির্ভর করছে আলোর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এবং দীর্ঘমেয়াদে এ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের উপর এবং আলোর মূল প্রকৃতির পূর্ণচিত্র বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো উন্মোচিত হয়নি।

ফোটনের সাথে সম্পৃক্ত শক্তি হলো ভৌতশক্তি যা বিভিন্নভাবে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন হয়ে পদার্থের মৌল কণা হিসেবে বিকশিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার পদার্থে পরিণত হয় যা আমরা অন্যত্র বিশদ আলোচনা করব। আল্লাহর সৃজনশীল জ্যোতির আরো বিভিন্ন স্তর আছে যা পদার্থ বা ফোটনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এবং সে প্রকার জ্যোতি থেকেই জীন, ফেরেস্তা ইত্যাদি তৈরী। যদিও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তিনি জীনকে অগ্নি ও ফেরেস্তাকে আলো থেকে তৈরী করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অগ্নি ও আলোকে বিশ্লেষণে যেসব তথ্য পেলেন তা সবই ভৌত ফোটনের বিভিন্ন রূপ মাত্র। তাই স্পষ্টত ফোটনের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের গবেষণার সীমার বাইরে রয়ে গেছে। তাছাড়া মানুষের আত্মা, তার চৈতন্যবোধ কোন্ প্রকৃতির শক্তির বাহক, তাও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বহির্ভূত রয়ে গেছে। তাই বিজ্ঞান কেবল ভৌত ফোটনের বিভিন্ন স্তরকে বর্ণনা করতে পারে, সম্পূর্ণ চিত্র নয়। মধ্যযুগে মুসলিম মুতাকাল্লিমগণ আল্লাহ তায়ালার সার্বিক সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে দু'টি মৌলিক সত্তার প্রস্তাব করেছিলেন :

একটি হলো জওহর, অন্যটি হলো আরাথ বা সংঘটন। জওহর হলো আকারহীন মাত্রাহীন কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্যহীন সত্তা, আর আরাথ হলো আল্লাহর সৃজনশীল শক্তির বিভিন্ন মাত্রা বিশিষ্ট্য সত্তা। জওহর আর আরাথের সমন্বয়ে আল্লাহর বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির মৌল উপাদান গঠিত হয়। তাই বর্তমান বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে ফোটন বলা হয়, সেটা হলো মুতাকাল্লিমদের বর্ণিত জওহর ও আরাথের সমন্বয়ে গঠিত অনেক উপাদানের মধ্যে একটি। কারণ একই প্রক্রিয়ায় জীন, ফেরেস্তা ও অন্যান্য অতি প্রাকৃতিক সত্তা এবং জৈবিক প্রকৃতি, চৈতন্যবোধ গঠিত। সেক্ষেত্রে জওহরের সাথে সম্পৃক্ত হয় আল্লাহর অন্য প্রকৃতির সৃজনশক্তি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ম্যাক্স প্লাংক বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন, যাকে তিনি নাম দেন 'কোনো কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় শক্তির ন্যূনতম একক' যা বর্তমানে প্লাংক ধ্রুবক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু প্লাংকের বিরোধিতা সত্ত্বেও আইনস্টাইন ও নিলস বোর এটার অর্থতে বিকৃতি এনে কোয়ান্টাম তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে বিজ্ঞানকে কলুষিত করার কাজ শুরু করেন (বলা হয় প্লাংক তার তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি এবং এটার প্রকৃত অর্থ বুঝেছেন কেবল

আইনস্টাইন)। বিগত দুই হাজার বছরের বেশী সময়কালে গ্রীক দার্শনিক ও মুসলিম দার্শনিকগণ সম্মিলিত গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত করেন এটম তত্ত্ব, যা হলো অতি ক্ষুদ্র কণা যা অবিভাজ্য এবং যাদের সমন্বয়ে ও বিভিন্ন মাত্রার শক্তির যোগফলে বিভিন্ন পদার্থ গঠিত। এটার আরবী পরিভাষা হলো জওহর। এটার সংজ্ঞা হলো এমন একটি ক্ষুদ্রতম একক যাকে গাণিতিক ও তাত্ত্বিকভাবে আর বিভাজন সম্ভব নয় আর এটার অস্তিত্ব লাভের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শক্তির নাম হলো আরাথ, বাংলায় সংঘটন, ইংরেজীতে এক্সিডেন্ট (accident)। অর্থাৎ এটা হলো শক্তির ন্যূনতম একক যার আর বিভাজন সম্ভব নয় এবং বর্তমান হিসাবে ন্যূনতম শক্তির একক হলো প্লাংক ধ্রুবকের গাণিতিক পরিমাণ।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এটম শব্দকে গ্রহণ করেছে তবে এটার অর্থ তার বোধগম্য হয়নি। ফলে আধুনিক অণু পরমাণু বিজ্ঞানে বলা হয়, বিজ্ঞানীরা পুরনো দিনের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করেছেন, কারণ তারা অণু পরমাণুকেও বিভক্ত করতে পেরেছেন। বস্তুত বিজ্ঞানীরা এটম শব্দকে বিভক্ত করেছেন, এটার প্রকৃতিকে নয়। কিন্তু তাদের এই বিভাজন প্রক্রিয়া এসে থেমে গেছে প্লাংক ধ্রুবকে এবং বলছেন এটার গাণিতিক মূল্যকে আর বিভাজন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ হাজার বছরের দার্শনিক গবেষণার এটম কিংবা মুসলিম মুতাকাল্লিমদের বর্ণিত জওহরের অস্তিত্ব লাভের জন্য আরাথের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শক্তির গাণিতিক পরিমাণ ছিলো অনির্ধারিত এবং ম্যাক্স প্লাংক সেটাই আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু জ্ঞানের ঐতিহ্য বঞ্চিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানীদের বিষয়টি বোধগম্য না হওয়ায় তারা এটার প্রকৃত অর্থ ও মূল্য বিকৃত করে কল্পনারাজ্যের সুউচ্চ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভঙ্গুর পিরামিড তৈরী করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি প্লাংক ধ্রুবকের চেয়েও ক্ষুদ্র একক আবিষ্কার হয় তবে সেটাই হবে এটম বা জওহরের ন্যূনতম শক্তি।

বস্তুত প্লাংক ধ্রুবকের প্রকৃত অর্থের সাথে বিচ্ছিন্ন আলোর প্যাকেট বা কোয়ান্টা-এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং ম্যাক্স প্লাংক আজীবন তার তত্ত্বের প্রকৃত অর্থের বাইরে কোনো বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন, এমনকি এ উপলক্ষে নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময়ের ভাষণেও প্লাংক ধ্রুবকের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ ও মূল্যায়নের ভার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আধুনিক অনেক তাত্ত্বিক ও গাণিতিক হিসাবে দেখা যায় অতি নিম্ন শক্তির আলোর মান প্লাংকের ন্যূনতম শক্তি সীমাকে অতিক্রম করছে।

ফোটন যখন তার সব শক্তি পদার্থকে, ধরা যাক ইলেকট্রনকে প্রদান করে, তারপর ফোটনের অবস্থা কি হয়– তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ

বিজ্ঞানী বলছেন ফোটনের তখন মৃত্যু ঘটে এবং পুনরায় পদার্থ যখন শক্তিতে প্রত্যাবর্তন করে তখন ফোটনের জন্ম হয়। পক্ষান্তরে মুতাকাল্লিমগণ বলছেন শক্তি হারালে দৃশ্যমান জওহর আগের অবস্থায় অর্থাৎ আকারহীন ও মাত্রাহীন হয়ে পড়ে তাই সে অদৃশ্য হয়ে যায় আবার প্রয়োজনীয় শক্তি পেলে দৃশ্যমান হয়ে উঠে।

আল্লাহ তায়ালার জ্যোতি যতদূর বিস্তৃত ততদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হলো বিশ্বজগৎ এবং মহাবিশ্বের পরিসীমাকে কুরআনিক পরিভাষায় একটি অনন্য সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে "সিদরাতুল মুনতাহা।" বাংলায় কাঁটাযুক্ত কুলজাতীয় বৃক্ষের ঝোপ যা অতিক্রম করা সম্ভব নয়; ইংরেজীতে "Lote tree- uppermost boundary" অর্থাৎ স্থানকালের তন্তুর বুননের পরিসীমা (Fabrics of space-time continuum) যার উপমা ঝোপের সদৃশ্য । এটা হলো পার্থিব বিশ্বের শেষসীমা। এটার পর স্থানকাল নেই তাই গতি অসম্ভব এবং এটা অতিক্রম করা অসম্ভব এবং এটার ভেতরের দিকে হলো স্বর্গোদ্যান।

আল্লাহর নূর : ফোটন-ইলেকট্রন-প্রোটন (পদার্থ)

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর থেকে এন্ডারসনসহ আরো অনেক বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে স্থানের অতি সংকীর্ণ অঞ্চলে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতিতে ও পর্যাপ্ত শক্তির অনুপস্থিতিতে ১.০২ মেগা ইলেকট্রন ভোল্টের গামা রশ্মি বা ফোটন ভেঙ্গে একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনে পরিণত হয় কিংবা দু'টি গামা রশ্মি পরস্পর সংঘর্ষেও ইলেকট্রন ও পজিট্রন পাওয়া যায়। **ইলেকট্রন ও পজিট্রন একই ভর বিশিষ্ট ৫১১ কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট কিন্তু বিপরীত আধান বিশিষ্ট। একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনের ভর যৌথভাবে একটি গামা রশ্মির ভরের সমান।** এটা বিজ্ঞানের যুগান্তরকারী আবিষ্কার এবং এটার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা অভিনব ও বিভিন্ন রকম। ফোটনকে যদি আমরা আলোর একক বলি এবং ইলেকট্রনকে যদি পদার্থের একক বলি তবে এটা হলো আলো আর পদার্থের সম্পর্কের একটি চরম ক্রান্তিলগ্ন। ফোটন হলো তরঙ্গ ও কণা দ্বৈত প্রকৃতির কিন্তু এটা যখন ভেঙ্গে ইলেকট্রন পজিট্রনে পরিণত হয় তখন এরা কেবল কণা, এদের তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য নেই এবং আলোর সাধারণ গতিবেগও এদের নেই। আকারগত দিক থেকে এরা ফোটনের চেয়ে স্থূল ও কম গতিবেগ সম্পন্ন। যদিও ডি ব্রোগলি ইলেকট্রনকেও তরঙ্গ ও কণা দ্বৈত প্রকৃতির বলে প্রস্তাব করেছেন কিন্তু প্রফেসর কানারভ তা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন না। তার মতে এটা বিজ্ঞানে গৃহিত অন্যতম বিভ্রান্তি।

গামা রশ্মির সাথে ইলেকট্রনের বৈশিষ্ট্যগত কি কি পার্থক্য আছে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে নেই, শুধু বলা আছে ইলেকট্রনের ভর বা শক্তি গামা রশ্মির অর্ধেক। কিন্তু বিষয়টি বোধগম্য হবার জন্য এ তথ্য যথেষ্ট নয়। তবু আমরা মৌলিকভাবে যে পার্থক্য দেখতে পাই তা হলো যদিও ফোটন ও ইলেকট্রন উভয়েই বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি সম্পন্ন তথাপি ফোটনের গতিবেগ ইলেকট্রনের তুলনায় বেশী এবং মানুষের তৈরী কোনো ত্বরণযন্ত্র শত চেষ্টা করেও ইলেকট্রনের গতিকে ফোটনের সমান করতে পারছেন না। গাঠনিক কাঠামোর দিক থেকে ইলেকট্রন ফোটনের চেয়ে কম ঘনত্বপূর্ণ এবং বেশী বিন্যস্ত তাই কেন্দ্রীয় ভর বেশী স্থিতিশীল এবং এ স্থিতিশীলতার কারণে এটার গতি আলোর সমান হতে পারে না। **বলা যায় ইলেকট্রন হলো ফোটনের তরঙ্গধর্মী বৈশিষ্ট্যের একটি ফাঁস (Loop) যা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।**

এদিকে ফোটন তরঙ্গ ও কণাধর্মী বিধায় তার গতিবেগের শক্তির উৎস প্রসঙ্গ এড়িয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন তার শক্তি অক্ষত থাকে এবং তাকে সুদীর্ঘকাল চলার

শক্তি প্রদান করে। **কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে একমত নই, আমাদের বক্তব্য হলো ফোটন স্থানিক কাঠামো থেকে অবিরাম শক্তি গ্রহণ করে এবং ফোটনকে গতি প্রদান করে তাই তার শক্তি দৃশ্যত অক্ষত মনে হয় এবং এ শক্তি গ্রহণ কোনো কারণে ব্যাহত হলে তার গতি থেমে যাবে।**

পক্ষান্তরে ইলেকট্রন আপন অক্ষে আবর্তন করে (spin) এবং এ আবর্তন স্পষ্ট প্রমাণ করে তার কোনো বাহ্যিক শক্তির উৎস আছে যা বিজ্ঞানীদের জন্য বিব্রতকর। তারা এ প্রসঙ্গকে আড়াল করতে চান এবং এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে তারা পরমাণুর জগতে প্রোটনকে ঘিরে ইলেকট্রনের আবর্তন ঘটনা ব্যাখ্যা করতে বলেন। এতে ইলেকট্রনের কোনো শক্তিক্ষয় হয় না এবং এটাও আমরা মানতে পারি না। **ইলেকট্রনও স্থান বা প্রবাহমান ইথার থেকে শক্তি লাভ করে এবং তা গতিশক্তি হিসেবে ব্যবহার করে। এ শক্তি না পেলে ইলেকট্রনের গতিও থাকবে না।**

পদার্থের দ্বিতীয় অন্যতম মৌলকণা হলো প্রোটন কিন্তু এটার গঠন ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক জটিল এবং এটার গঠন কাঠামোর পুরো চিত্র এখনো উদ্ঘাটিত হয়নি। প্রোটন অনেকগুলো অতিক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হলো কোয়ার্ক ও নিউট্রিনো। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মূলপ্রবাহের বাইরের কিছু বিজ্ঞানীদের ধারণা স্থানের অতি সংকীর্ণ পরিসরে বিশেষ পরিস্থিতিতে দু'টি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন কিংবা দু'টি পজিট্রন ও একটি ইলেকট্রন স্থানিক কাঠামো থেকে পর্যাপ্ত শক্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলে তারা পরস্পর একটি অটুট আন্তঃবন্ধনে আবদ্ধ হয় যাকে বলা যায় ট্রাইয়েড। এই ট্রাইয়েডের ত্রিমাত্রিক বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি পরস্পরকে আকর্ষণ করে কেন্দ্রীয় ভরের দিকে সংকুচিত হয় এবং এটার আকার ছোট হতে থাকে এবং ভর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটার আকার ছোট হতে থাকলে তার ব্যাসার্ধ কমে আসে এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। সংকোচনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় ভরের স্থির বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় বিকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি ক্রান্তিক সীমায় এসে সংকোচন থেমে যায়। পরিশেষে এটা ইলেকট্রনের তুলনায় হাজার গুণ ক্ষুদ্র এবং তিনটি ইলেকট্রনের সম্মিলিত ভর ৬০০ গুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়ে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে আসে এবং সংকুচিত ইলেকট্রন পজিট্রন কোয়ার্ক নামে পরিচিত হয়। দু'টি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনের কিংবা দু'টি পজিট্রন ও একটি ইলেকট্রনের বন্ধন সংকুচিত হয়ে ভিন্নরূপী বৈশিষ্ট্যে বিকর্ষিত হয় এবং তখন এদের নাম হয় দু'টি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক কিংবা একটি আপ কোয়ার্ক ও দু'টি ডাউন কোয়ার্ক। এই তিনটি কোয়ার্ক সমন্বিত যে সত্তা গঠিত হলো তার নাম নিউট্রন।

নিউট্রন অস্থিতিশীল এবং আবার কিছু সময় পর একটি অপরা আধান নির্গত করে প্রোটনে পরিণত হয়। (Andre Michaud- On the expanded maxwellian geometry of space).

এখানে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। নিউট্রন অস্থিতিশীল এবং সৃষ্টির ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর একটি ইলেকট্রন নির্গত করে প্রোটনে পরিণত হয় কিন্তু বাস্তবতা হলো নিউট্রন থেকে ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় না বরং একটি দূরত্বে এসে স্থিতিশীল হয় এবং বস্তুত এটাই হলো হাইড্রোজেন। তাই নিউট্রন হলো হাইড্রোজেনের সংকুচিত সত্তা যেখানে ইলেকট্রন ও প্রোটন একত্রিত হয়ে আছে। যদিও বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থে এটা উল্লেখ নেই এবং কোনো পরমাণু বিজ্ঞানী এ বিষয়ে কিছু বলছেন না তবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে এটাকে হাইড্রোজেন পরমাণু হিসেবে চিহ্নিত করতে কোনো যৌক্তিক বিরোধিতা নেই।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ্য যা বিজ্ঞানের সব গ্রন্থ থেকে উধাও হয়ে গেছে এবং এটা হলো চৌম্বকশক্তি। এ শক্তি বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় দূরত্বের ঘন ব্যস্তানুপাতিক কিন্তু নিউটনের মহাকর্ষসহ অন্যান্য শক্তি হলো বর্গের ব্যস্তানুপাতিক (Magnetostatic inverse cube law : Andre Michaud)। নিউটনসহ তার অনুসারীরা শত চেষ্টা করেও এ দু'টোকে সাদৃশ্যমূলক সূত্র বলে প্রমাণ করতে পারেননি। পরবর্তীতে এটা কুলম্ব ও ফ্যারাডের হাতে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তিতে বিবর্তিত হয়ে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলে গৃহিত হয়। পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন-নিউট্রন চৌম্বকীয় শক্তির দূরত্বের ঘন ব্যস্তানুপাতের আকর্ষণের প্রভাবে শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এককভাবে নিউট্রন হলো প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত, তাই এখানে প্রোটন ও ইলেকট্রন চৌম্বকীয় বিকর্ষণে পৃথক হয় এবং একটু দূরত্বে এসে স্থির বিদ্যুতীয় আকর্ষণে স্থিতিশীল হয় এবং এটাই হলো হাইড্রেজেন। পরমাণু তত্ত্বের এখানে পরস্পর দু'টি বিপরীতমুখী অবস্থান আমরা দেখতে পাই। নিলস বোরের পরমাণু তত্ত্বে ইলেকট্রনের বিভিন্ন স্থির কক্ষপথের কল্পনা করা হয়েছে– এই অজুহাতে যে এরকম কক্ষপথ না হলে ইলেকট্রন আবর্তন কালে শক্তি হারিয়ে কেন্দ্রে পড়ে যাবে এবং প্রোটনের সাথে সংঘর্ষে পরমাণু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাদারফোর্ড প্রস্তাব ও আরো কয়েক বছর পর প্রমাণ করেন তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বেটা নির্গমন যা মূলত ইলেকট্রন পরমাণুর কেন্দ্র থেকেই বের হয়। তিনি আরো প্রমাণ করেন ইলেকট্রন বাইরে থেকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে। এখন বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন নিউট্রন থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা এ তথ্যকে আড়াল করে গেছেন কারণ এটা স্বীকার করলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে। অর্থাৎ প্রোটন কিংবা নিউট্রনের সাথে ইলেকট্রনের সহঅবস্থানে

পরমাণু ধ্বংস হবার সম্ভাবনা নেই এবং ইলেকট্রনের জন্য স্থির কক্ষপথের কল্পনার যৌক্তিকতাও নেই।

প্রোটন হলো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্থায়ী ও স্থিতিশীল কণা। এটা ইলেকট্রনের তুলনায় হাজার গুণ ক্ষুদ্র ও ১৮৩৬ গুণ ভারী এবং এ কারণে এটার গতি ইলেকট্রনের তুলনায় কম।

প্রোটনের আভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ও স্থির বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের গাঠনিক কাঠামো বিজ্ঞানীদের কাছে সুস্পষ্ট নয় তাই পারমাণবিক বলের প্রকৃতি এখনো অজ্ঞাত এবং তাই সে ব্যাপারে আমরা কোনো বক্তব্য দেব না। আর এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করতে গেলেই বলা হয় কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডিনামিক (QED) ও কোয়ান্টাম ক্রোমোডিনামিক (QCD) ছাড়া এটা বোধগম্য হবে না। কিন্তু আমাদের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সত্যনিষ্ঠতা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই প্রোটনের অভ্যন্তরে অন্যান্য কণিকা সম্বন্ধে আলোচনায় না গেলেও আমাদের সাধারণ জ্ঞানের জন্য কোনো অসুবিধা হবে না।

নিউট্রনের ভর প্রোটনের তুলনায় ২$\frac{১}{২}$ ইলেকট্রনের ভর বেশী। কিন্তু নিউট্রন থেকে এককভাবে একটি ইলেকট্রন বা তার ভগ্নাংশ বিয়োগ হতে পারে না। সেখান থেকে বিয়োগ হতে পারে কেবল দু'টি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন কিংবা দু'টি পজিট্রন ও একটি ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত তিনটি ইলেকট্রনের ভর। কিন্তু **নিউট্রনের তুলনায় প্রোটন ২$\frac{১}{২}$ ইলেকট্রনের ভর কম।** তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা এমতাবস্থায় প্রায় $\frac{১}{২}$ ইলেকট্রনের ভর বিশিষ্ট একটি নিউট্রিনোর জন্ম হয় যদিও কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় দাবী করা হয় নিউট্রিনো ভর বিহীন (ভরহীন শব্দ পদার্থিক জগতে বস্তুত অর্থহীন)। এটাতে কোনো আধান নেই কারণ আধান যুক্ত হয় প্রোটনে। (Ph. Kanarev- The foundation of the physi-chemistry of the microworld)

নিউট্রিনো হলো বিশ্বের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য কণা অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্র কোনো কিছুই এটার গতি রোধ করতে পারে না। সূর্য কিংবা আরো ভারী নক্ষত্রকে এটা অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা সূর্য থেকে নিকটতম নক্ষত্র আলফা সেন্টরাই পর্যন্ত সীসার প্রাচীর তৈরী করলেও নিউট্রিনোর গতি রোধ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহর জ্যোতিপূর্ণ ক্ষেত্র বা স্থান বা প্রবাহমান ইথার থেকে আমরা পেলাম উচ্চশক্তি সম্পন্ন আলো বা ফোটন, ফোটন থেকে পেলাম ইলেকট্রন, পজিট্রন; সেটা থেকে নিউট্রন, প্রোটন। আল্লাহর জ্যোতির গতিবেগ অপরিসীম, তা থেকে উদ্ভূত ফোটনের গতি ধাপে ধাপে অনেক কম যা বর্তমানে আলোর সাধারণ গতি, ফোটন থেকে উদ্ভূত ইলেকট্রনের গতি আলোর চেয়ে কম, ইলেকট্রন পজিট্রন থেকে উদ্ভূত নিউট্রন প্রোটনের গতি আরো কম। ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন মিলে যখন

বিভিন্ন মৌল পদার্থ গঠিত হয় তাদের গতি আরো কম। অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভৌত শক্তি যখন বিভিন্ন ধাপে স্থূল হতে থাকে তার গতিও তত কমে আসে।

ইলেকট্রন প্রোটন আবিষ্কারের সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা মৌল পরমাণু গঠন সর্ম্পকে কিছুটা ধারণা পেতে শুরু করেন কিন্তু শুরুটা হলো চরম বিভ্রান্তি দিয়ে। বিজ্ঞানের সব গ্রন্থে বর্ণিত আছে রাদারফোর্ড প্রস্তাব করলেন প্রোটনকে ঘিরে ইলেকট্রন আবর্তন করে কিন্তু এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে সে ব্যাপারে বিজ্ঞানের ইতিহাস নিরব। এমনকি রাদারফোর্ডের মূল লেখায় আমরা সরাসরি এ ধরনের কোনো বক্তব্য খুঁজে পেলাম না বরং আমরা এ প্রস্তাব খুঁজে পেলাম নিলস বোরের লেখায়। তখনো প্রোটন ও নিউট্রন আবিষ্কার হয়নি, কেবল রাদারফোর্ড আবিষ্কার করেছেন পরমাণুর কেন্দ্রীয় অঞ্চল পরা আধান বিশিষ্ট এবং তা ইলেকট্রনের ভরের তুলনায় অনেক গুণ বেশী এবং তিনি এটাও বলেন, এ তথ্য পরমাণুর গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী নিলস বোরের জন্য এ তথ্যই যথেষ্ট কারণ এটুকু তথ্য থেকেই তিনি তত্ত্বের জাল বুনন করতে পারেন। এটা হলো নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য।

পরবর্তী পর্যায়ে রাদারফোর্ড প্রোটন আবিষ্কারের পর তিনি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমন্বয়ে নিউট্রনের অস্তিত্বের ভবিষ্যৎ বাণী করলেন কিন্তু ততদিনে কোয়ান্টাম তত্ত্ব গাণিতিকভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং রাদারর্ফোডের প্রস্তাব কোয়ান্টাম তত্ত্বের পরিপন্থি বিধায় তা অস্বীকার করা হয়। ঠিক এ কারণে বিজ্ঞানের সব গ্রন্থে ১৯১১ সালের রাদারফোর্ডের এটম মডেলের কথা উল্লেখ করে ১৯১৩ সালে নিলস বোরের এটম মডেলের বক্তব্য দিয়ে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেয়া হয় এবং ১৯১৪, ১৯১৯, ১৯২০ এমনকি ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কারের পর রাদারফোর্ড কি বক্তব্য দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করা হয় না। রাদারফোর্ড মূলত রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং সবসময় চেষ্টা করছিলেন পরমাণুতে রসায়ন বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ করতে, কিন্তু নিলস বোর ছিলেন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী এবং তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর জন্য পদার্থিক বাস্তব বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার চেয়ে চমকপ্রদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বেশী। বস্তুতঃ নিউট্রন আবিষ্কারের পর পরমাণু তত্ত্ব গঠনের উদ্যোগ নিলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের উদ্ভব হত না। প্রোটনকে ঘিরে ইলেকট্রনের আবর্তন না করার কি কি যুক্তি থাকতে পারে সে ব্যাপারেও ইতিহাস নিরব। কিন্তু প্রোটনকে ঘিরে ইলেকট্রনের আবর্তনের প্রস্তাবে গাণিতিক হিসাবের গড়মিল দেখা দিল যে এরকম আবর্তনে ইলেকট্রনের শক্তি ক্ষয় হয়ে সে প্রোটনে পড়ে যাবে এবং পরমাণুর অস্তিত্ব থাকবে না। ইলেকট্রনের সাথে প্রোটনের সংযোগ হলে কেন পরমাণু অস্তিত্বহীন হবে তার কোনো সঠিক যুক্তি কিংবা দার্শনিক ব্যাখ্যা আমরা বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থে খুঁজে পেলাম না।

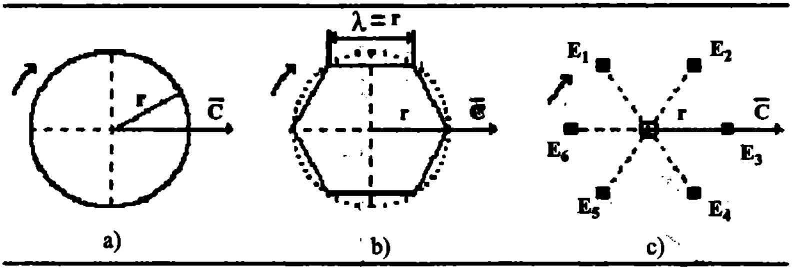

To photon structure revelation

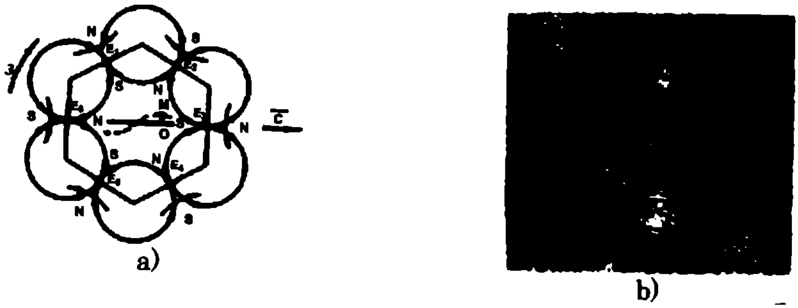

Diagrams of the electromagnetic models of the photon :
a) theoretical model, b) simulated model

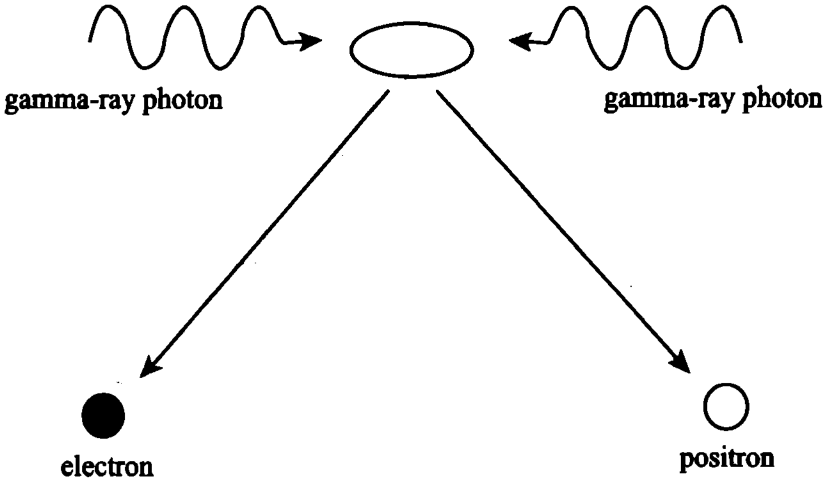

When two high energy gamma-ray photons collide, an electron/ positron pair are produced (the energy is converted into mass, $E=mc^2$)

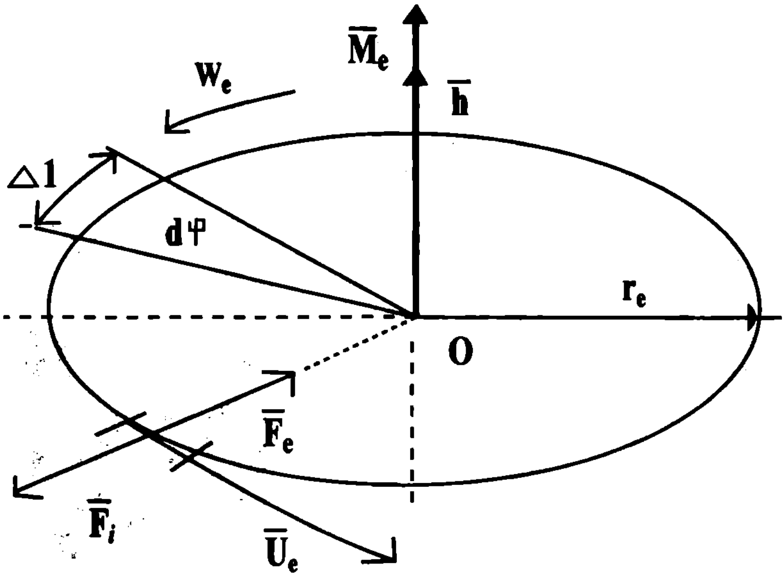

The circuit of ring model of electron

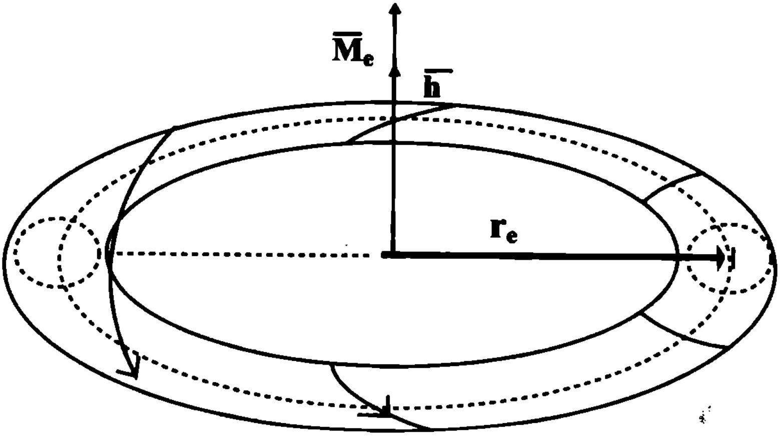

The circuit of model of electron

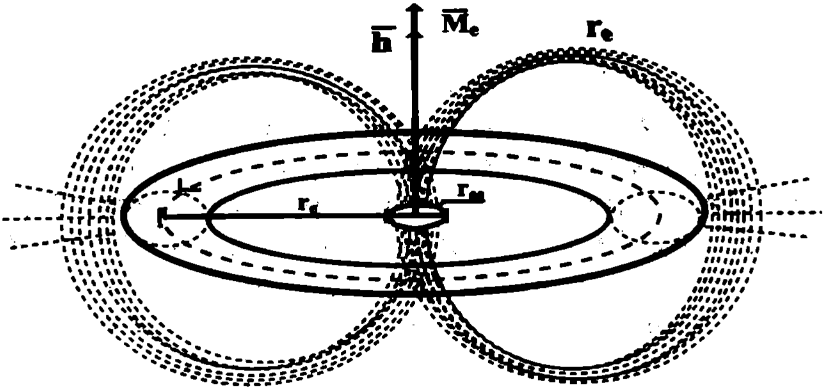

The circuit of electromagnetic model of electron
(in figure the part electric is shown only and
magnetic force lines)

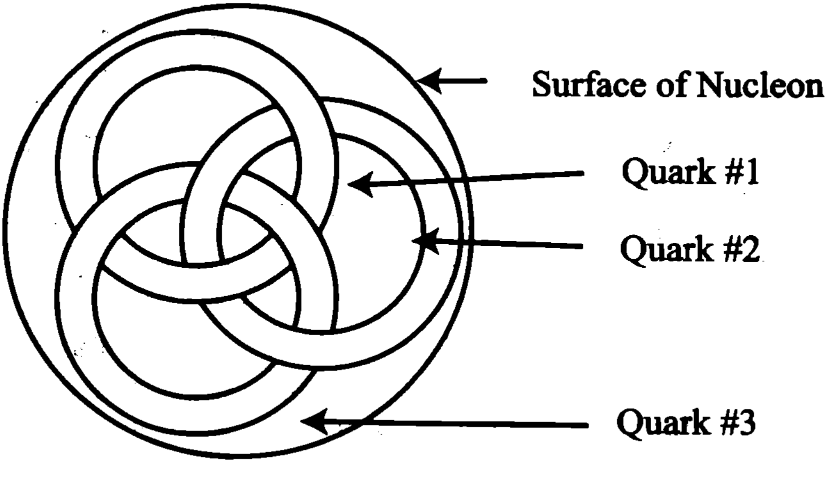

হিসাবের এ গরমিল ও অসামঞ্জস্যতার সঠিক উত্তর অন্বেষণের প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা খুঁজে পাই না। বরং আমরা দেখতে পাই অস্থির মনের অপরিপক্ক বুদ্ধির কিছু তরুণ যাদের চিরায়ত জ্ঞানের কোনো ভিত্তি নেই, আছে শুধু হাতের কাছে প্রাপ্ত কিছু অসমর্থিত বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং সেসব ব্যবহার করেই তারা বুদ্ধির অগম্য তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন। নিলস বোর ইলেকট্রনের জন্য কতগুলো স্থির কক্ষপথের কল্পনা করলেন এবং বললেন, এ কক্ষপথে পরিভ্রমণে ইলেকট্রনের শক্তি ক্ষয় হবে না, কেবল শক্তি যোগ বিয়োগ হলে কক্ষপথ পরিবর্তন হবে। এখানে আমরা জেনোর প্যারাডক্স পুনরায় দেখতে পাই। নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণে কেন তার শক্তি ক্ষয় হবে না তার উত্তর নেই। আর এরকম অদ্ভুত ধারণা তিনি গ্রহণ

করলেন আইনস্টাইন কর্তৃক বিকৃত প্লাংক তত্ত্ব থেকে এবং আইনস্টাইনও উপলব্ধি করলেন তার তথ্য বিকৃতির পরিণতি নিলস বোরের হাতে কি ভয়াবহ রূপে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। **আইনস্টাইন নিজের মিথ্যে তত্ত্বের ফাঁদে আটকা পড়ে গেলেন এবং মিথ্যের বিভৎস দৈত্য তার হাতছাড়া হয়ে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীদের হাতে আরো শক্তিশালী হলো এবং হাজার বছরের চিরায়ত একত্ত্ববাদে বিশ্বাসী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হলো। আইনস্টাইন জীবনের বাকী অর্ধেক সময় বৃথা নষ্ট করলেন নিলস বোর-হাইজেনবার্গ কর্তৃক বিকশিত কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিভ্রান্তকর ও উদ্ভট দূরকল্পনের বিরুদ্ধে তর্কবিতর্ক করে।**

তাছাড়া নিলস বোরের পরমাণুর মডেলের ইলেকট্রনের বিভিন্ন কক্ষপথে লক্ষ দিতে ইলেকট্রন কি গতিবেগে চলে এবং কতক্ষণ সময় লাগে তার কোনো বর্ণনা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার কোনো গ্রন্থে নেই। প্রফেসর কানারভের ভাষায় টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের বিভ্রান্ত মতবাদ প্রায় দুই হাজার বছর টিকেছিল এবং নিলস বোরের প্রোটন কেন্দ্রীক ইলেকট্রন পরিভ্রমণের মতবাদ একশত বছরের বেশী টিকছে না (সাথে সাথে টিকছে না বিশেষ কিংবা সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব), কিন্তু টলেমীর মতবাদ দুই হাজার বছরে মানব জ্ঞানের যে ক্ষতি করেছে বিগত একশত বছরে নিলস বোরের পরমাণু মতবাদ মানব জ্ঞানের ক্ষতি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী।

প্রফেসর কানারভ প্রমাণ করেছেন প্রোটনকে ঘিরে আবর্তন করার মতো গতিশক্তি ইলেকট্রনের নেই। তাছাড়া প্রোটনকে ঘিরে ইলেকট্রনের আবর্তন সত্য হলে রসায়ন, জীববিজ্ঞান, জৈবরসায়ন সবই অসম্ভব হবে কারণ একাধিক ইলেকট্রন এভাবে আবর্তন করলে স্থিতিশীল রাসায়নিক যৌগ গঠন গাণিতিক বা জ্যামিতিকভাবে অসম্ভব। ডি. বি. লারসনের (D.B. Larson) ভাষায় বর্তমান কোয়ান্টাম পরমাণু বিজ্ঞান হলো সীমাহীন কল্পন (Postulates unlimited)। রবার্ট পি. ল্যানিগানের মতে কোনো সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন রসায়ন বিজ্ঞানীর পক্ষে নিলস বোরের পরমাণুবাদ মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী জ্যোতিষীবিদ্যা কিংবা যাদুবিদ্যা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু নিলস বোরের পরমাণুকে নয় এমনকি নিলস বোর ও হাইজেনবার্গের হাতে কোয়ান্টাম কোপেনহেগীয়ান মতবাদ (Copenhegian interpretation of quantum machanics) প্রতিষ্ঠিত হলে কোয়ান্টামের জনক বলে বিবেচিত আইনস্টাইন ও ম্যাক্স প্লাংক পর্যন্ত সেটার বিরোধিতা করেন। প্রফেসর কানারভের আনবিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের গভীরে না গিয়ে আমরা শুধু তার কাছ থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠনচিত্র ও অন্যান্য পরমাণুর ও যৌগের চিত্র উপস্থাপন করব।

বর্ণনার সুবিধার জন্য আমরা ভরকে গ্রামের পরিবর্তে ইভিতে (ইলেকট্রন ভোল্ট) প্রকাশ করি তবে **ইলেকট্রনের ভর .৫১১ এম.ইভি (মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট) এবং প্রোটনের ভর ৯৩৮ এম.ইভি এবং এরা যখন পরস্পর যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু গঠন করে তখন তাদের পারমাণবিক বন্ধন শক্তি হল ১৩.৬০ ইভি।** এটাকে বড় আকারে দৃশ্যমান করে বর্ণনা করলে বলা যায় প্রোটনের আকার যদি ১ মিলিমিটার হয় তবে ইলেকট্রনের আকার হবে ১ মিটার এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব হবে ১০০ মিটার। এটার গাঠনিক চিত্র নিম্নরূপ–

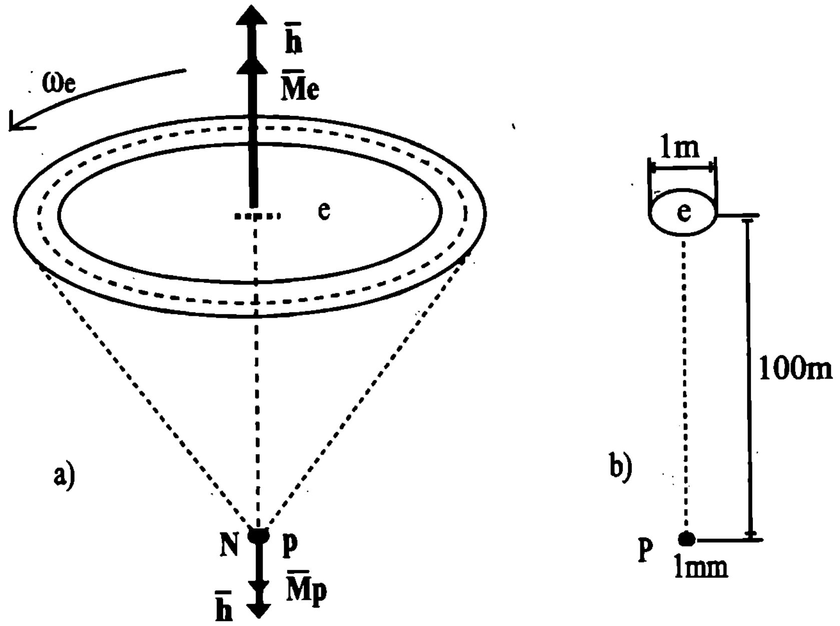

Diagram of the models of the hydrogen atom

এমতাবস্থায় একটি ফোটন থেকে ১০.০৯ ইভি শক্তি ইলেকট্রনে যোগ হলে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যে কুলম্ব সূত্রের অধীনে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বল বৃদ্ধি পায় এবং ইলেকট্রন দূরে গিয়ে দ্বিতীয় শক্তিস্তরে চলে আসে। দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আবার ১২.০৯ ইভি শক্তি যোগ হলে বিকর্ষণ বল আরো বৃদ্ধি পেয়ে তৃতীয় শক্তি স্তরে চলে আসে। এভাবে শক্তি যোগ হতে হতে ১৩.৬০ ইভি পর্যন্ত পৌছালে ইলেকট্রন প্রোটনের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পড়ে। এখানে প্রোটনকে ঘিরে ইলেকট্রনের বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তনের অবকাশ নেই।

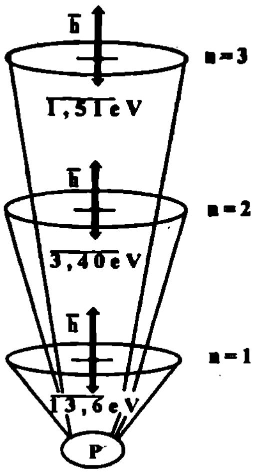

Diagram of energy jumps of the electron of the hydrogen atom

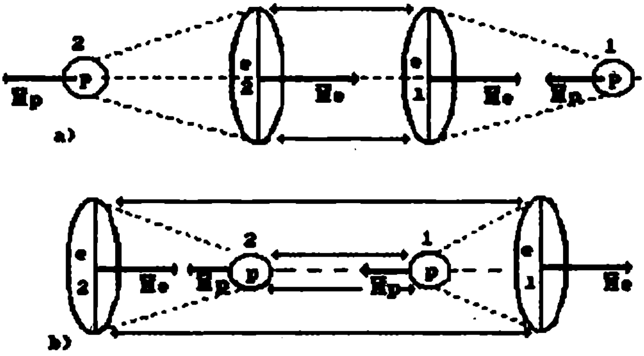

H_2 Diagrams of the hydrogen molecul

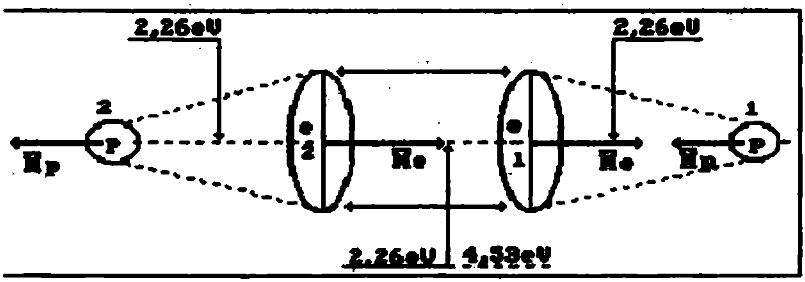

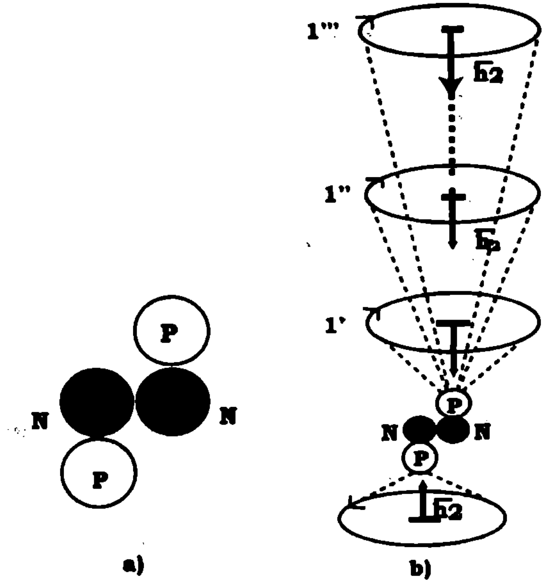

Diagrams: a) of the nucleus and b) of the atom of helium, which has no magnetic moment

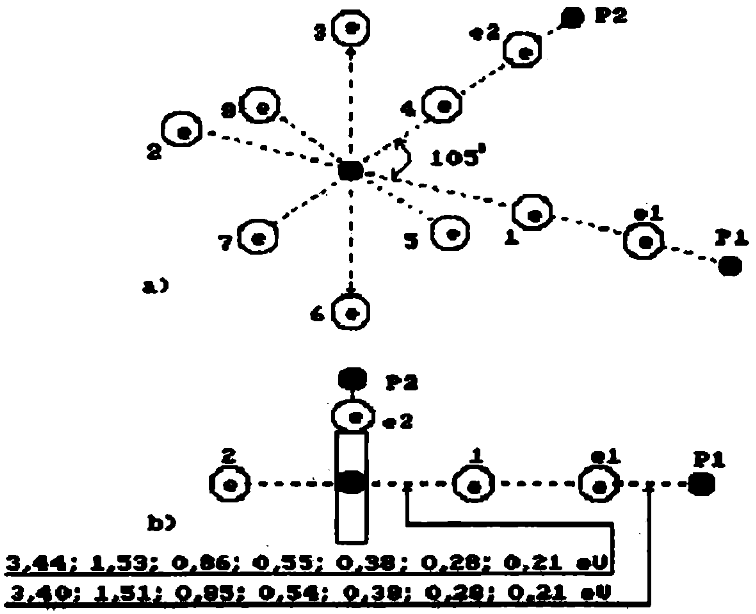

Structure of the water molecule at an angle of 105° between the hydrogen atoms

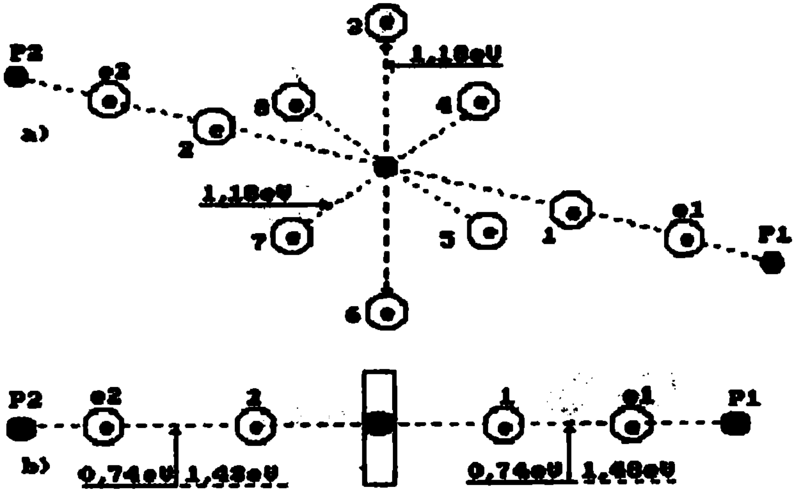

Structure of the water molecule: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are the numbers of the electrons of the oxygen atom, are the nuclei of the hydrogen atoms (the protons); P_1, P_2 electrons of the oxygen atom, are e_2 and e_1 the numbers of the electrons of the hydrogen atoms

পারমাণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম ও অন্যান্য মৌল পরমাণু গঠন প্রক্রিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়নকারী সবারই জানা। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হল উত্তপ্ত বিক্রিয়া (hot fusion) যা প্রাকৃতিকভাবে সূর্যে সংঘটিত হয় এবং বিকল্প মতবাদ হলো শীতল বিক্রিয়া (cold fusion) যার মাধ্যমে ভারী পানি (Heavy water) সাধারণ তাপমাত্রায় স্বল্পমাত্রার বৈদ্যুতিক বিক্রিয়ার প্রচুর পরিমাণ শক্তি গামা রশ্মি হিসেবে নির্গত করে হিলিয়াম উৎপন্ন করতে পারে এবং একইভাবে অন্যান্য মৌল পরমাণুও উৎপন্ন করার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

আলো বা ফোটন সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় আলোর মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনো অন্ধের হাতি দেখার প্রচেষ্টারত মাত্র। **তাই বলা হয় আলোকে দেখা হলো অদৃশ্যকে দেখা যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বহির্ভূত এবং যাকে দেখা যায় তা হলো ইথারের মোড়কে আবৃত একটি শক্তির প্রবাহ।** নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞান নিজ ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে ইথারের মোড়ক অনাবৃত করতে অসমর্থ। এজন্য প্রয়োজন বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তার অমৃত ও পবিত্র বাণী (Holiest of the holy)।

পরবর্তীতে আমরা দেখব ইথারের মোড়ক উন্মোচন করলে কি পরম সত্য পাওয়া যায়।

ফোটন, ইলেকট্রন ও প্রোটনের গাঠনিক কাঠামো চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের সবারই কেন্দ্রস্থল ফাঁকা, যেখান দিয়ে আল্লাহর নূর প্রবেশের কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। বিশ্বের কঠিনতম ও স্থায়ী কণা হলো প্রোটন কিন্তু প্রোটন সম্পূর্ণভাবে কঠিন নয়, তার কেন্দ্রস্থলও ফাকা যার মধ্যদিয়ে আল্লাহর নূর প্রবেশ করে। আর হাইড্রোজেনসহ অন্যান্য মৌলকণা ও যৌগকণার অভ্যন্তরে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যকার দূরত্ব অনেক বেশী। প্রোটনের চেয়ে অন্য কোনো কণা বেশী ঘন নয় এবং আল্লাহর নূর প্রবাহ কোনো কণাকে আর বেশী ঘন হতে দেয় না। আর যদি তাত্ত্বিকভাবে ধরে নেয়া হয় প্রোটনের চেয়ে বেশী ঘন কোনো কণা আছে তবে তার শক্তি হবে অকল্পনীয় মাত্রায় বেশী কারণ এমতাবস্থায় সে কণা আল্লাহর নূর থেকে শক্তি লাভ করবে অত্যধিক এবং সে শক্তি কণাকে বিদীর্ণ করে ভেঙ্গে ফেলবে কিংবা সে কণা প্রচণ্ড শক্তিতে গামা-রে বার্স্টের মতো তেজ বিকিরণ করবে। তাই আমাদের মতে বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানে গাণিতিকভাবে কৃষ্ণবিবর সম্ভব হলেও বাস্তবে এটার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কারণ পদার্থের প্রায় অসীম ঘনত্বের অর্থ হল স্থানিক কাঠামোর কোনো বিন্দুকে তথা আল্লাহর নূরকে প্রতিস্থাপন কিংবা সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা এবং কোনো বিন্দুই তাত্ত্বিকভাবে স্থানবিহীন বা আল্লাহর নূরবিহীন হতে পারে না, তাই এটা অসম্ভব।

মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্নসীমা

গত শতাব্দীতে প্রথম দশকে মানুষ আকাশে উড়তে শিখেছে, ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক উপগ্রহ নিক্ষেপের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করতে শিখেছে এবং ১৯৬৯ সালে পৃথিবীর একমাত্র নিকটতম প্রাকৃতিক উপগ্রহ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে আকাশ বিজয়ের সুদীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ করেছে। বিভিন্ন গ্রহে মনুষ্যবিহীন রকেট পাঠিয়ে জীবন ধারণের উপযোগী গ্রহ সন্ধান করে বর্তমানে মঙ্গল গ্রহে উপনিবেশ গড়ার আয়োজন চলছে এবং তার জন্য উপযুক্ত কারিগরী দক্ষতা অর্জনের গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহাকাশ স্টেশন থেকে প্রথমে চন্দ্রে ও পরে সেখান থেকে মঙ্গল গ্রহে অন্তত কয়েকজন নভোচারী কয়েকদিনের জন্য হলেও অবস্থান করবে এবং শতাব্দী শেষে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবে। পরবর্তী শতাব্দীতে সৌরজগৎ পেরিয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র আলকা সেন্টরাই অভিযানের কল্পনাও অনেক অতীব উৎসাহী নভোবিজ্ঞানীগণ দেখছেন।

এসব ভবিষ্যৎ অভিযানের বাস্তব সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ মতভেদ আছে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের কিছু সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে এবং সেটাই হলো আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়। আমরা আল-কুরআনের দু'টি আয়াত বিশ্লেষণ করে দেখব যে মানুষের মহাকাশ অভিযান বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি পর্যায়ে এসে থেমে যাবে যাকে সে অতিক্রম করতে গেলে তা হবে মানব জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যা প্রতিহত করার কারিগরী দক্ষতা মানুষ অর্জন করতে পারবে না।

আল-কুরআনের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদে বিভিন্ন অনুবাদকের মধ্যে পরিভাষাগত বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবু সবার ভাবার্থ মিলিয়ে সূরা আর-রাহমানের ৩৩ ও ৩৫ নং আয়াতের যে অর্থ পাওয়া যায় তা হলো :

"হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়, তোমরা যদি আকাশমণ্ডলীর সীমা অতিক্রম ও পৃথিবীর গভীরে প্রবেশ করতে পার তবে কর কিন্তু তোমরা তা পারবে না বিশেষ ক্ষমতা ব্যতিরেকে।"

"সেখানে তোমাদের উভয়ের উপর প্রেরিত হবে ধোয়াহীন অগ্নিশিখা এবং গলিত ধাতু যা থেকে নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করতে পারবে না।"

আল-কুরআনের আধুনিক ব্যাখ্যাকারীগণ বিশেষত যারা কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন অনুসন্ধান করে তার বর্ণনা দিতে সচেষ্ট, তারা সবাই প্রথম আয়াতটির

প্রথম অংশে মহাকাশ বিজয়ের ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি 'বাইবেল বিজ্ঞান ও কুরআন' গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক মরিস বুকাইলিও একই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু এ আয়াতের আরেকটি অংশে পৃথিবীর গভীরে প্রবেশের বিষয় সম্বন্ধে কারো কোনো গ্রন্থে কিছু বলা নেই। প্রথম আয়াতটির বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় আয়াতটির প্রসঙ্গে কারো কোনো বক্তব্য বা টীকা আমাদের হাতে পড়েনি অথচ এ আয়াতটির অর্থ বৈজ্ঞানিকভাবে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও জিন সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বক্তব্য দেবার মতো কোনো তথ্য এখনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রভুক্ত হয়নি ভবিষ্যতে তাদের গবেষণার বিষয় হতে পারে এই অর্থে যে আল-কুরআনের বর্ণনানুসারে আল্লাহ্ তায়ালা জিন সৃষ্টি করেছেন অগ্নির লেলিহান শিখা থেকে এবং এই লেলিহান শিখার অনেক অজানা অদৃশ্য তথ্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। তাদের গবেষণা আরো ব্যাপক ও সূক্ষ্ম হলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে জিনের দৈহিক গঠনের উপাদান সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন এবং বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অতিপারমাণবিক কণা যা গবেষণাগারে বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না, তাদের সমন্বয়ে অন্য ধরনের জীবনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন না। যাহোক, আমরা আপাততঃ জিনজাতি বাদ দিয়ে মানবজাতির বিষয়ে আলোচনা করব।

আলোচ্য আয়াতে আকাশের সীমা অতিক্রমের পাশাপাশি পৃথিবীর গভীরে প্রবেশ এবং তার জন্য বিপুল শক্তি বা ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। মানুষ নভোযানে চড়ে চন্দ্রে পদার্পণ করেছে এবং বিভিন্ন গ্রহে মনুষ্যবিহীন রকেট পাঠাচ্ছে বলে এটার প্রতি সবার দৃষ্টি পড়েছে কিন্তু পৃথিবীর গভীরে প্রবেশের বিষয়টি এখনো বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত বাস্তব প্রকল্প বলে বিবেচিত হয়নি। এ পর্যন্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার গভীরে খনিজ সম্পদ অন্বেষণে কূপখনন করা হয়েছে এবং সমুদ্রে গভীর তলদেশে মানুষ পৌঁছাতে পেরেছে। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন পৃথিবীর গভীরে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় : ১০ কিলোমিটার গভীরে ১৮০০ সেলসিয়াস, ৮০ কিলোমিটারে ১০০০০ সেলসিয়াস, ২৯০০ কিলোমিটারে ৩৭০০ সেলসিয়াস, ৫২০০ কিলোমিটারে ৪৩০০ সেলসিয়াস এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা সম্বন্ধে মতভেদ আছে তবে তা ৫০০০ থেকে ৭০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রীয় বলয়ের তাপ সূর্যের পৃষ্ঠের প্রায় সমান বা বেশী। পৃথিবীর ২০০০ থেকে ২৫০০ কিলোমিটার গভীরের স্তর উত্তপ্ত গলিত লোহা, নিকেল, সালফারের সমন্বয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয়

বলয়ে আছে চন্দ্রের সমান আকৃতির কঠিন লৌহপিণ্ড যা আবার পৃথিবীর গতিবেগের অতিরিক্ত বেগে প্রতি ৪০০ থেকে ৬০০ বছরে আপন অক্ষে একবার আবর্তন করে। কেন্দ্রের এই অতিরিক্ত ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিশাল ডায়নামো চৌম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে যা পৃথিবীর উপরিভাগে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। যাহোক বিজ্ঞানের কারিগরী প্রযুক্তি আরো উন্নত হলে মানুষ পৃথিবীর গভীরে প্রবেশ করতে গেলে আক্ষরিক অর্থেই তপ্ত গলিত ধাতুর বাধার সম্মুখীন হতে হবে যা প্রতিরোধের ক্ষমতা মানুষের দূর ভবিষ্যতেও হবার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ মানুষ বিপুল শক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর গভীরে কিছুদূর অগ্রসর হতে পারলেও কেন্দ্রীয় বলয়ে পৌছানো সম্ভব হবে না।

এখন উর্ধ্বাকাশ প্রসঙ্গে আসা যাক। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে উক্ত আয়াতে বর্ণনা করেছেন মানুষ বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে আকাশে গমণ করতে পারবে কিন্তু আরো বেশী উর্ধ্বে উঠতে গেলে তার প্রতি প্রেরিত হবে ধোয়াহীন তেজী অগ্নিশিখা যা থেকে সে নিজেকে প্রতিরক্ষা করতে পারবে না। মহাকাশে ধোয়াহীন তেজী অগ্নিশিখা বর্তমান যুগের জ্ঞানের প্রেক্ষিতে ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অর্থ হয় অদৃশ্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যা নভোচারীরা মহাকাশ ভ্রমণের সময় মুখোমুখি হন। আকাশের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বিভিন্ন প্রকৃতির এবং তাদের ক্ষতিকর প্রভাব মানবজীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ বিষয়ে আমরা আলোকপাত করে দেখব মহাকাশ ভ্রমণের মানুষের নিরাপত্তাহীনতা কত ভয়ংকর।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের মাঝের শূন্যস্থান বাস্তবিকই শূন্য কিন্তু পরে তারা আবিষ্কার করলেন এ শূন্যস্থানসমূহ বিভিন্ন প্রকৃতির পরা অপরা মৌলকণা, পরমাণু, অতি-বেগুনী রশ্মি, এক্স-রে, আলফা, বেটা ও গামা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদিতে পূর্ণ। পৃথিবী থেকে দূরত্ব ও মানবজীবনের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবের বিবেচনায় এ সব বিকিরণকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হয় :

১. পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ও ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ

২. সৌরবায়ু ও সৌরশিখা

৩. আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ ও মহাজাগতিক রশ্মি

১. পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ও ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ

পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ দুই মেরু বরাবর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে এক ধরনের শক্তিশালী বিকিরণ বলয় সৃষ্টি হয়েছে যাকে বলা হয় ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ। এই বলয় সৌরবায়ু ও শিখার তেজস্ক্রিয় বিক্রিরণ থেকে পৃথিবীর

বায়ুমণ্ডলকে রক্ষা করে কিন্তু এ বলয়ের আবার নিজস্ব বিকিরণ আছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এটার দু'টি অংশ– প্রথমটিকে বলা হয় আন্তঃবিকিরণ বলয় এবং দ্বিতীয়টি বহিঃবিকিরণ বলয়। **প্রথমটির উচ্চতা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৭০০ থেকে ১০,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টির উচ্চতা ১৩০০০ থেকে ৬৫০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তবে বিকিরণের প্রগাঢ়তা ১৪৫০০ থেকে ১৯০০০ কিলোমিটারের মধ্যে বেশী।** বলয় দু'টিতে আছে মুক্ত ইলেকট্রন ও প্রোটন, আলফা কণা ও অক্সিজেন আয়ন যা মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এ বলয়ে নভোযান ও নভোচারী বেশীক্ষণ অবস্থান করলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে চন্দ্রাভিযানে অ্যাপোলো নভোযান খুব স্বল্প সময়ের জন্য এ বলয়ে অবস্থান করায় জীবনের ঝুঁকির বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর অতীতে বিভিন্ন মহাকাশ স্টেশন যেমন স্কাইল্যাব, মীর এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন স্পেস শাটল, সবই ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের অনেক নিচু স্তরে অবস্থান করার ফলে বিকিরণ মুক্ত থাকতে পারছে।

২. সৌরবায়ু ও শিখা

ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের পরই শুরু হয় সৌরবায়ু ও শিখার বিকিরণ অঞ্চল। সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন ধ্বংস করে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে লক্ষাধিক হাইড্রোজেন বোমা ফুটিয়ে চারপাশে বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে দেয়। বিশেষত সূর্যপৃষ্ঠে মাঝে মাঝে বিপুল আকৃতির লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে যার তাপমাত্রা সূর্যপৃষ্ঠের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী এবং তার তেজ প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার বেগে ছড়িয়ে পড়ে। এই সৌরবায়ুতে আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম আয়ন, অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স-রে ও গামা রশ্মি, যা নভোযানের প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করে নভোচারীদের আক্রান্ত করার ফলে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে। মানুষের আকাশ বিজয়ের অভিজ্ঞতা কেবল চন্দ্র পর্যন্ত সীমিত অর্থাৎ স্বল্প দূরত্বের ও স্বল্প সময়ের। কিন্তু মানুষের পরবর্তী লক্ষ্য মঙ্গল গ্রহে পদার্পণ এবং অদূর ভবিষ্যতে নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেন্টরাই অভিযানের স্বপ্নও দেখছে। মহাকাশের এসব দূরবর্তী অঞ্চলে নভো-অভিযানের অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান, কারিগরী দক্ষতা ও উৎকর্ষতা ও অর্থব্যয়, খাদ্য সরবরাহ, শূন্য অভিকর্ষে দীর্ঘ মেয়াদি শারীরিক ও মানসিক জটিলতা, বাস্তব উপযোগিতা এসবই বিবেচনাধীন থাকলেও আমদের লক্ষ্য শুধু বিকিরণের বিপদ সংকুলতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা। নভোযাত্রা বিষয়ক ডাক্তারী গবেষণায় দীর্ঘ মেয়াদী বিকিরণের কারণে নভোচারীদের যেসব বিপদ ঘটতে পারে তা হলো :

১. চোখে ছানি ও দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া,

২. শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া,

৩. গড় আয়ু কমে যাওয়া,

৪. স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হওয়া,

৫. চর্ম কান্সারসহ অন্যান্য কান্সারের সম্ভাবনা,

৬. ডি.এন.এ. এবং আর.এন.এ.-এর বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়া,

৭. মানব অস্থি ও অস্থি মজ্জার ক্ষয়,

৮. মস্তিষ্কের ও নিউরনের কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলতা,

৯. রক্তকণিকা উৎপাদন ব্যাহত ও শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি,

১০. হরমুন ও বিভিন্ন এনজাইমের কর্মক্ষমতার হ্রাস।

মানব শরীরে বিকিরণ অনুপ্রবেশের পরিমাণকে যেভাবে হিসাব করা হয় তাকে বলা হয় রেম (REM) এবং আরেকটি এককও আছে যার নাম রাড (RAD)। বিকিরণের পবিমাণ বৃদ্ধির সাথে শারীরিক অসুস্থতার যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা হলো :

০ থেকে ৫০ রাড : কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই,

৫০ থেকে ১২০ রাড : কয়েকদিনের মধ্যে অসুস্থতার সম্ভাবনা ১০%,

১৩০ থেকে ১৭০ রাড : কয়েকদিনের মধ্যে অসুস্থতার সম্ভাবনা ২৫%,

১৮০ থেকে ২২০ রাড : কয়েক ঘণ্টায় মধ্যে অসুস্থতার সম্ভাবনা ৫০%,

২৭০ থেকে ৩৩০ রাড : অসুস্থ ১০০%, মৃত্যুর সম্ভবনা ২০%,

৪০০ থেকে ৪৮০ রাড : মৃত্যুর সম্ভাবনা ৫০%,

৫০০ থেকে ৬০০ রাড : ৩০ দিনের মধ্যে ১০০% মৃত্যু।

বিকিরণ বিষয়ক চিকিৎসা বিজ্ঞান একজন নভোচারীকে সারা জীবনে ১০০ রাড সীমা ঝুঁকিপূর্ণ বলে নির্ধারণ করেছে এবং তাই একজন নভোচারীর চাকুরী জীবন ৩ থেকে ৫ বছরের বেশী হতে পারবে না।

মহাকাশে বিভিন্ন নভোযানে নভোচারীগণ যে বিকিরণ গ্রহণ করে থাকেন তা হলো :

অ্যাপোলো-১৪৯ দিনে ১.১৪ রেম

স্কাইল্যাব-৪৮৪ দিনে ৭.৮১ রেম

মীর স্টেশন ১৮০ দিনে ১৭.২০ রেম

স্পেস স্টেশন ৯০ দিনে ৯.০০ রেম

স্পেস শাটল প্রতি মিশনে ৭.৮৬৪ রেম

পক্ষান্তরে পৃথিবীতে সাধারণ অবস্থায় প্রতিটি মানুষ বছরে ৩০০ মিলি রেম বিকিরণ প্রাকৃতিকভাবে গ্রহণ করে থাকে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, বুকে প্রতি এক্স-রে ২০ মিলি রেম, প্রতি সি.টি. স্কানে ৭০০ মিলি রেম বিকিরণ মানুষকে গ্রহণ করতে হয়। যে সব বিজ্ঞানী বিভিন্ন পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের চুল্লির নিকটবর্তী এলাকায় কাজ করেন তাদের দেহে বিকিরণের পরিমাণ বেশী। তবে তাদের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিকিরণের সীমা বছর প্রতি ৫ রেম। একটি মানবদেহে সারা জীবনের জন্য মোট বিকিরণের সর্বোচ্চ সীমা ২০০ থেকে ৪০০ রেম। এই সীমা অতিক্রম করলে জটিল ক্যান্সারসহ অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব বেশী।

এসব হলো পৃথিবীর নিকটবর্তী অর্থাৎ ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের নীচের নিরাপদ অঞ্চলের হিসাব। ভ্যান অ্যালেন বলয়ে বিকিরনের পরিমাণ প্রতি ঘণ্টায় ১০০০ রেম এবং এটার বাইরে বিকিরণ প্রতি বছরে ৪০০ রেম। কিন্তু মানুষের মঙ্গল গ্রহ অভিযানের অধিকাংশ সময় তাকে থাকতে হবে সৌরবায়ু ও শিখার বিকিরণের মধ্যে যার পরিমাণ হবে উপরে প্রদত্ত হিসাবের চেয়ে অনেক বেশী। দুই থেকে আড়াই বছরের অভিযানে প্রতিটি নভোচারীকে বিকিরণ গ্রহণ করতে হবে ১০০০ রেমের বেশী। অনেকের হিসাবে পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহের ২৫২ দিনের যাত্রায় ৩৯০ রেম, সেখানে ৪১৮ দিন অবস্থানে ৩২০ রেম, প্রত্যাবর্তনের ২৫৯ দিনে ৪০০ রেম এবং অ্যালেন বলয় দুই বার পার হবার সময় ৪০ রেম সর্বমোট ১১৫০ রেম বিকিরণ প্রতি নভোচারীকে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহ অভিযান শেষে ভাগ্যক্রমে জীবিত ফিরে আসলেও নভোচারীকে দ্বিতীয়বার আর মহাকাশ ভ্রমণে যাবার শারীরিক সুস্থতা থাকবে না। মঙ্গল গ্রহ অভিযানের আরেকটি বিপদ হলো সৌরঝড় যা প্রতি ১১ বছরের চক্রে বিপুল আকৃতি ধারণ করে এবং তখন বিকিরণের পরিমাণ অত্যধিক। মাঝারি আকারের সৌরশিখায় প্রতি ঘণ্টায় ১০০ রেম এবং বড় আকারের শিখায় তিন চার গুণ বেশী বিকিরণ থাকে। সৌরঝড়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিকিরণ ২৬০০ রেম পর্যন্ত হতে পারে এবং এ সময় কোনো নভোচারী অরক্ষিত অর্থাৎ নভোযানের বাইরে থাকলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু অবধারিত। অ্যাপোলো নভোচারীদের ভাগ্যবান বলা হয় কারণ ঐ সময়ে সৌরবুক বেশ শান্ত ছিলো, তাই তাদেরকে সৌরবায়ুর বিপদজনক বিকিরণের মুখোমুখি হতে হয়নি।

যাহোক মহাকাশ অভিযানে যারা অত উৎসাহী তাদের মতে এসব তথ্য বাস্তবের চেয়ে বাড়াবাড়ি করে দেখিয়ে তাদেরকে হতাশ করানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ বিকিরণের প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়তো আরো বেশী কার্যকর ও উপযুক্ত প্রযুক্তি মানুষের করায়ত্ত হবে কিন্তু ঝুঁকি থেকেই যাবে। বিশেষত যে নভো-পোশাক পরে নভোচারীদের নভোযানের বাইরে মাঝে মাঝে কাজ করতে হয় তা সৌর বিকিরণ থেকে মোটেই সুরক্ষিত নয়। এখানে উল্লেখ্য যে সৌরঝড়ের প্রবল প্রতাপ মাঝে মাঝে পৃথিবীতেও আঘাত হানে। ১৯৮৯ সনের ১৩ মার্চ ঠিক এ রকম আঘাত পড়েছিল কানাডার বৃহত্তম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কিউবেকে, যার ফলে এ প্রদেশের গ্রিড লাইন ও বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো প্রায় ছয় বিলিয়ন ডলার। উত্তর আমেরিকার বড় বড় সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও ভবিষ্যৎ সৌরঝড়ের আঘাতের ঝুঁকির মুখোমুখি।

৩. আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ ও মহাজাগতিক রশ্মি

বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সৌরজগতের প্লুটোর পর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ওর্ট মেঘ নামে একটি স্তরে আছে বিলিয়ন বিলিয়ন ছোট বড় ধূমকেতু। পৃথিবীর জীবনের নিরাপত্তার জন্য এই মেঘের স্তরের ভূমিকা অপরিহার্য। সৌরজগতের শেষপ্রান্তকে (যদিও তা এখনো সুনির্ধারিত নয়) বলা হয় সৌর বলয়, যাকে ঘিরে আছে আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ– যা অতিশয় তেজস্ক্রিয় কণায় পূর্ণ। যদিও এ মেঘের স্তর খুবই পাতলা তবে তাপমাত্রা অত্যধিক (প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) অর্থাৎ সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রার সমান। তাই এ স্তরে নভোযান পৌছুলে তাপের প্রভাব অনুভব না করলেও তার বিকিরণ জীবনের জন্য বিপদজনক হবে। সৌরবায়ুর প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে এ বিকিরণ সৌরজগতে প্রবেশ করতে পারে না তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা সৌরবায়ুর গতি ও তেজ মাঝে মাঝে কিছু কমে আসলে এ বিকিরণ সৌরজগতে প্রবেশ করে এবং অনেকের ধারণা দূর অতীতে ইতোমধ্যে কয়েক বার এ বিকিরণ পৃথিবীতে আঘাত হেনে জীব জগতের ক্ষতির কারণ হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত যত মনুষ্যবিহীন রকেট যেমন পাইওনিয়ার, ভয়েজার, গ্যালিলিও, ইউলিসিস ইত্যাদি দূর আকাশের জন্য পাঠিয়েছেন তাদের কোনোটি এখনো এ স্তরে পৌছেনি। তাই এ বিষয়ে বাস্তব পর্যবেক্ষণগত তথ্য অপর্যাপ্ত। যাহোক যে আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ সূর্যসহ আশে পাশের কয়েকটি নক্ষত্রকে ঘিরে আছে তাকে বলা হয় লোকাল বাবল এবং তারই একটি অপেক্ষাকৃত হালকা স্তরে

বর্তমানে অবস্থান করছে আমাদের সৌরজগৎ যাকে বলা হয় লোকাল ফ্লাফ। এই মেঘের অপেক্ষাকৃত ঘন স্তরটি সৌরজগতের দিকে প্রতি সেকেন্ডে ২০০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে। ধারণা করা হয় নিকট অতীতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো সুপারনোভার বিস্ফোরণ থেকে মেঘটি সৃষ্টি হয়েছিল এবং ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ বছর পূর্বে সৌরজগৎ এ মেঘের স্তরে প্রবেশ করেছে এবং ভবিষ্যতের আরো ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর সময় লাগবে এটা অতিক্রম করতে। অনেক জীববিজ্ঞানী আবার মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীর অরিয়ন বাহুর এই মেঘের স্তরে সৌরজগতের অবস্থানকে পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের আবির্ভাবের সাথে সম্পর্কিত বিষয় বলে ধারণা করতে আগ্রহী।

যাহোক বিকিরণের এ সব স্তরের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু নিশ্চিত হতে চাই আকাশের কতগুলো নিরাপত্তার বলয়ে বেষ্টিত হয়ে আমরা সুরক্ষিত। মিল্কিওয়ের অরিয়ন বাহুর আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘে আবৃত হয়ে আছে আমাদের সৌরজগৎ। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই মেঘের স্তরটি মহাজাগতিক ক্ষতিকর বিকিরণ থেকে সৌরজগতকে রক্ষা করছে ফলে এখানে উন্নত জীবের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই মেঘের স্তর যে বিকিরণকে প্রতিহত করতে পারে না সেটাকে প্রতিহত করে সৌরবায়ু ও ওর্ট মেঘ। আবার সৌরবায়ুর বিকিরণকে প্রতিহত করে পৃথিবীর ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়। তারপরেও যেসব বিকিরণ পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয় তাকে প্রতিহত করে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর।

আমাদের জীবন ধারণের পরিবেশ নিচ্ছিদ্র করতে কয়েকটি নিরাপত্তার বলয় একের পর এক অবস্থান করছে। এসব নিরাপত্তার বলয় অতিক্রম করে বাইরে যেতে চাইলে তা হবে জীবনের জন্য অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু মহাকাশ জয়ের স্বপ্নবিলাসী কিছু অভিযাত্রিক এসব ঝুঁকির তথ্যকে বাগাড়ম্বর মনে করে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে বাস্তবে পরিণত করতে অতীব উৎসাহী। এ ব্যাপারে পবিত্র আল-কুরআনের সুস্পষ্ট সতর্কবাণী : মানুষ দূর আকাশে কখনো তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞান দিয়ে এটা উপলব্ধি করে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা আহ্বান জানান তার অতুলনীয় রহমত ও করুণা স্বীকার করে তার প্রতি যথাযত অনুগত হতে।

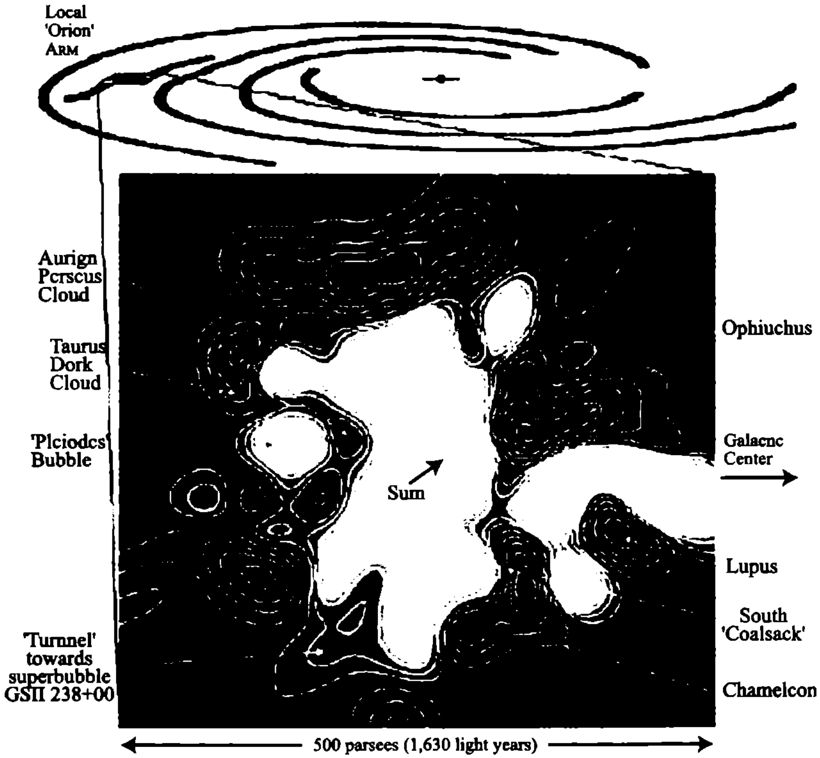

অরিয়ন বাহুতে সূর্য

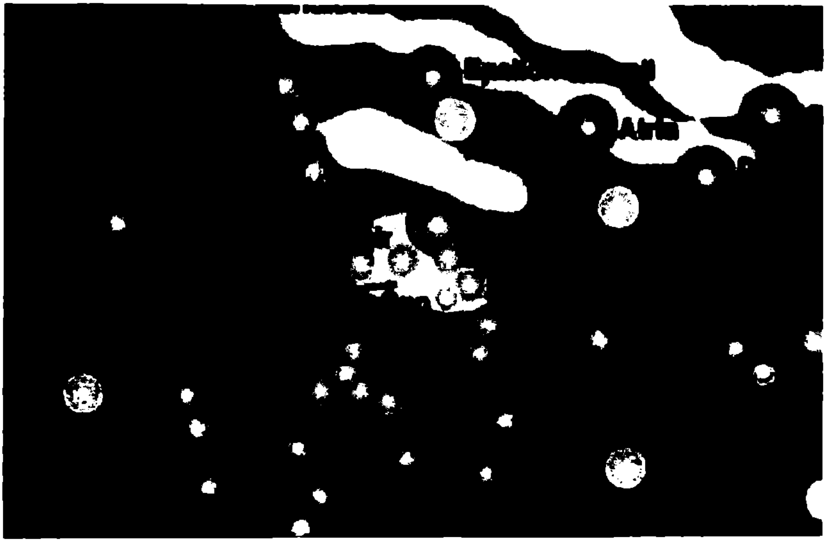

লোকাল ফ্লাফের মধ্যে সূর্য

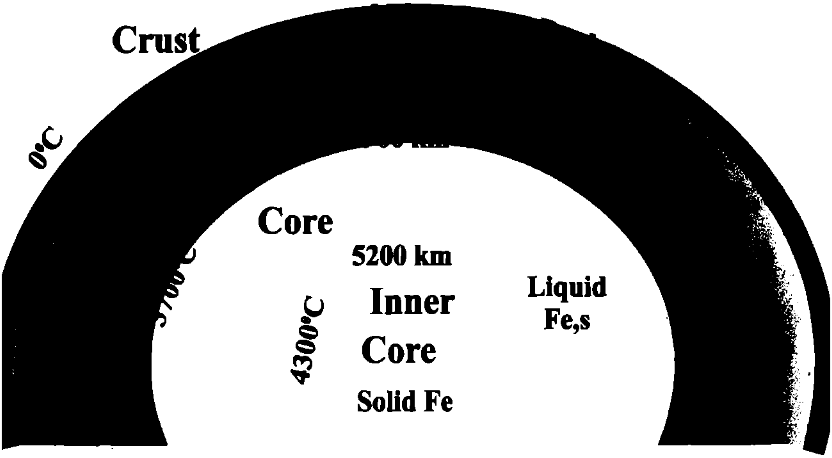

পৃথিবীর ভিতরের দৃশ্য

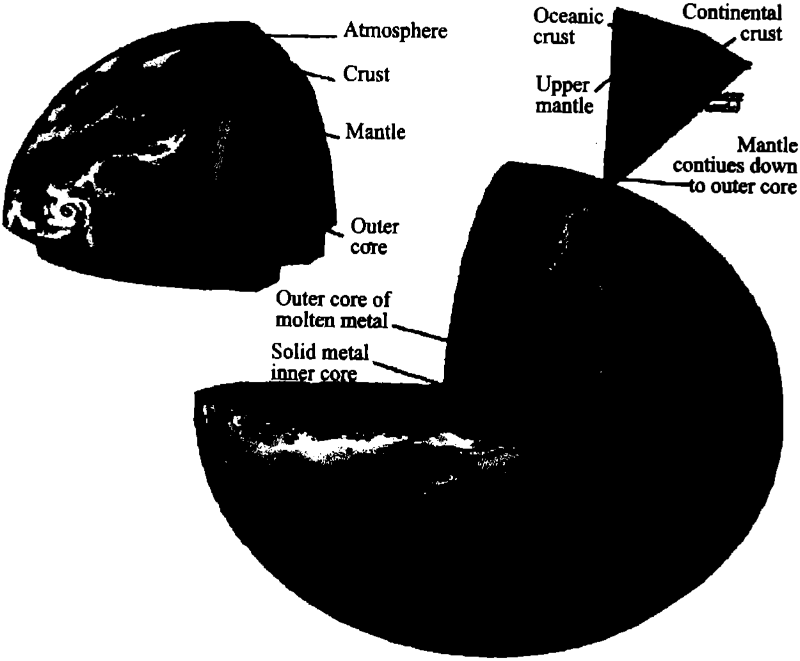

পৃথিবীর কেন্দ্রে ঘূর্ণায়মান কঠিন লৌহপিণ্ড

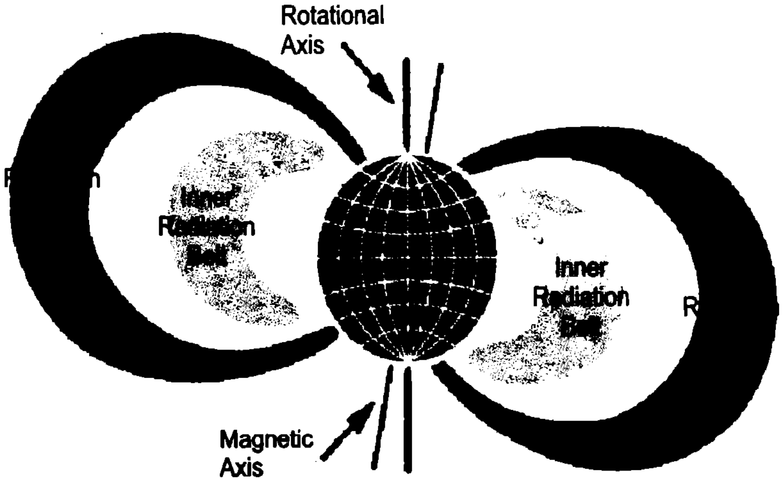

ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়

সৌরবায়ু ও পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র

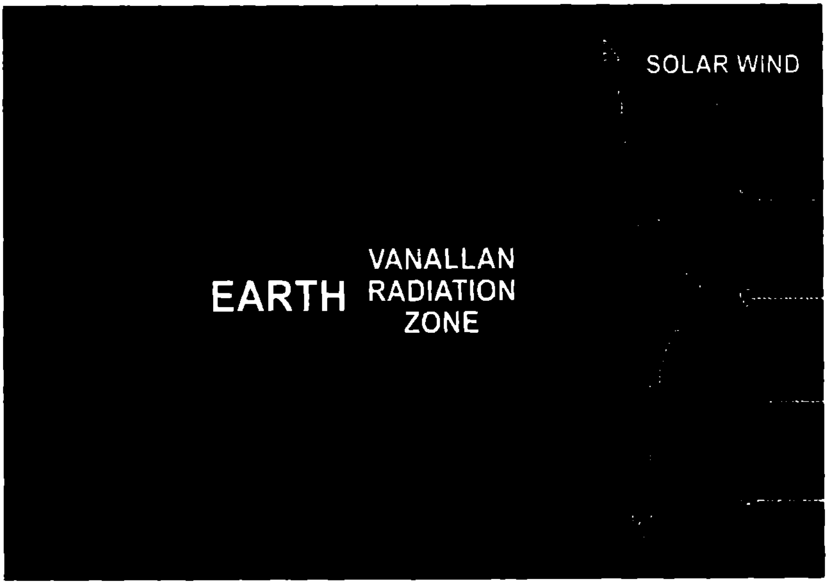

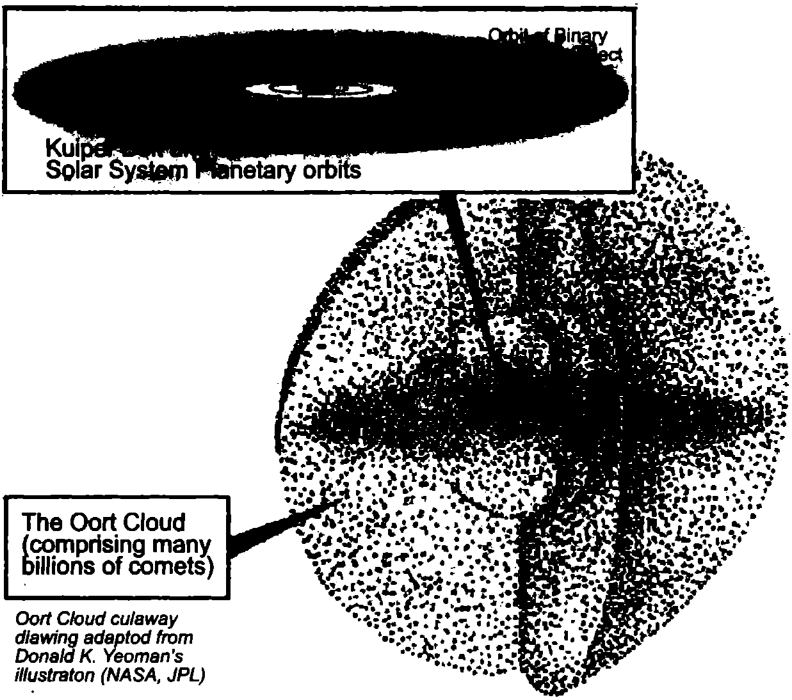

ওর্ট মেঘের স্তরে পরিবেষ্টিত সূর্য ও গ্রহসমূহ

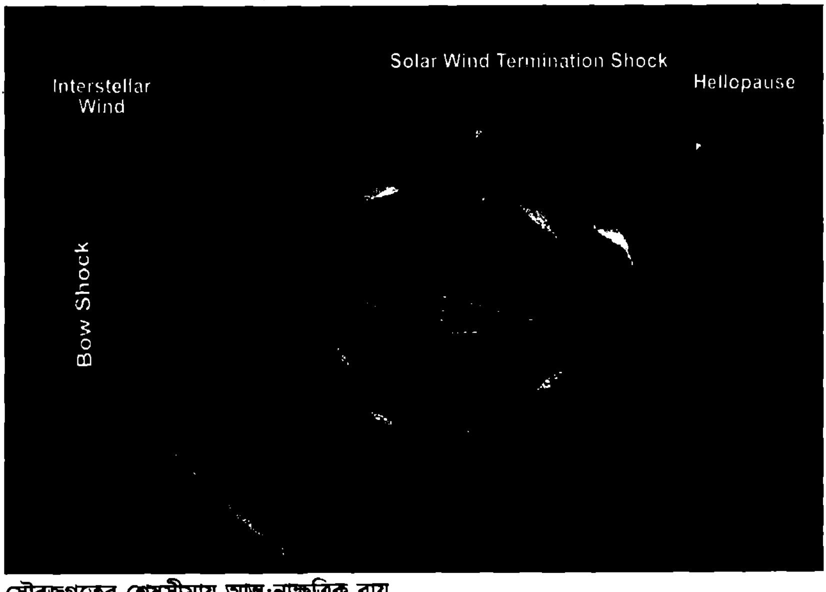

সৌরজগতের শেষসীমায় আন্ত:নাক্ষত্রিক বায়ু

লোকাল বাবলের মধ্যে সূর্যের অবস্থান

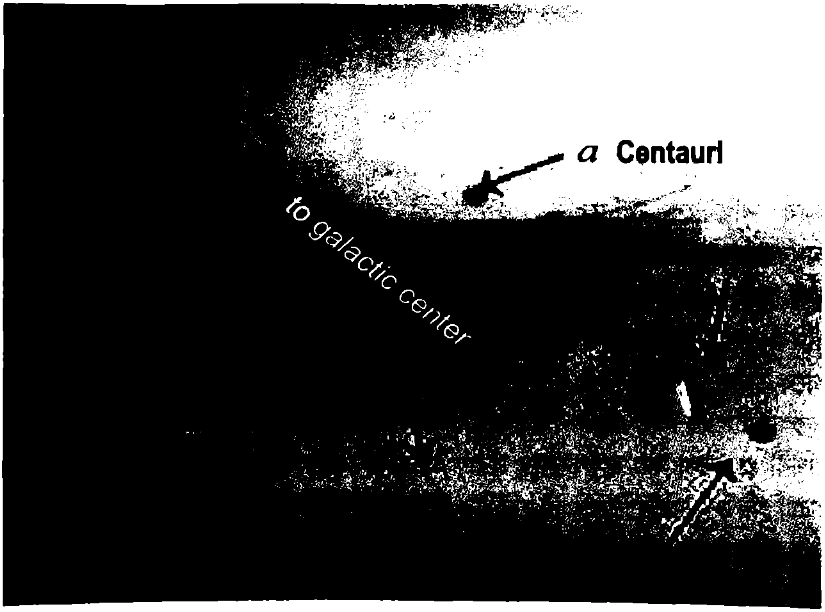

উত্তপ্ত গ্যাসীয় বলয়ে সূর্য

সপ্তাকাশ এবং তার সংরক্ষণ

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সাতটি আকাশ কিংবা আকাশের সাতটি স্তরের সৃষ্টি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ব্যাপক অর্থে সাতটি আকাশকে আমরা সমগ্র বিশ্বজগৎ বলে বিবেচনা করতে চাই। সাতটি আকাশ কিংবা আকাশের সাতটি স্তরকে সনাক্ত করতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ হাজার বছর ধরে বিভিন্ন রকম ব্যাখা দেবার চেষ্টা করেছেন এবং বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকেও এটার ব্যাখ্যা ও সনাক্তকরণের প্রচেষ্টা চলছে। তবু সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিক ও পর্যায়ক্রমিক কে কি ব্যাখ্যা করেছেন সেসবের পর্যালোচনায় না গিয়ে আমরা নতুন একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করব। আশা করি জ্ঞানপিপাসু সচেতন ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আগ্রহী হবেন।

যদিও পদার্থ বিজ্ঞানীগণ পদার্থিক বিশ্বজগতের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি মৌলিক শক্তিকে চিহ্নিত করেছেন তবু বিশ্বের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্র নিহারিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর মৌলিক শক্তি হলো মহাকর্ষ। নিউটনীয় মহাকর্ষ এবং আইনস্টাইনীয় আপেক্ষিক তাত্ত্বিক মহাকর্ষের বিতর্কে না গিয়ে আমরা এটাকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করে মহাকাশের সাতটি স্তর নির্ধারণের জন্য আমরা মহাকর্ষ শক্তিকে মূল নিয়ামক বিবেচনা করে অগ্রসর হব।

১. আকাশের প্রথম স্তর কিংবা প্রথম আকাশ

যেহেতু আমরা পৃথিবীর অধিবাসী তাই আমরা আকাশের প্রথম স্তরকে বিবেচনা করব পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত নিকটবর্তী আকাশ। পৃথিবীর মহাকর্ষণ শক্তি কার্যকরভাবে যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেটাই হলো এ আকাশের সীমা। তাই মেঘমণ্ডলসহ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর এবং চন্দ্র এ আকাশের অন্তর্গত। সে হিসেবে পৃথিবী থেকে মোটামুটি চার লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত এ আকাশ বিস্তৃত। চন্দ্র পৃথিবী থেকে প্রায় পৌনে চার লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে থেকে প্রতি সেকেন্ডে এক কিলোমিটারের কিছু বেশী গতিবেগে ২৭ দিনে আপন কক্ষে একবার ঘুরে ২৯ দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। চন্দ্রের দূরত্ব এবং গতিবেগ বর্তমানে যা আছে তা থেকে মাত্রাতিরিক্ত কমবেশী হলে পৃথিবীর আবহাওয়া, জোয়ারভাটা, ঋতুর পরিবর্তন এবং জীবন ধারণের পরিবেশ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। এ আকাশে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর সৌরবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে। এই আকাশের পরিসীমা দুই আলোক সেকেন্ড বলে বিবেচনা করা যায়।

২. আকাশের দ্বিতীয় স্তর কিংবা দ্বিতীয় আকাশ

পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে এবং তাই দ্বিতীয় আকাশকে আমরা বিবেচনা করব সূর্যের মহাকর্ষ শক্তি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সে হিসেবে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোসহ চন্দ্র এবং সব উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড সবই এ আকাশের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবী এ আকাশে সূর্য থেকে ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্বে আপন অক্ষে প্রতি সেকেন্ডে এগার কিলোমিটার বেগে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে ৩৬৫ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। প্লুটো গ্রহ কিংবা তার পরে আরো গ্রহ আছে কিনা সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবু প্লুটো সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২৫০ বছর এবং আলোর গতির হিসাবে এটার দূরত্ব ৬ আলোক ঘণ্টা। প্লুটোর পরে আরো কিছু ছোট ছোট গ্রহ আছে, যাদের বলা হয় বামন গ্রহ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুসারে সবচেয়ে দূরে যে বামন গ্রহ আছে সেটার নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন সেডনা এবং এটার প্রদক্ষিণ কাল ১২,০০০ বছর। **বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব এবং আকার জীবন ধারণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ।**

সৌরজগতের শেষপ্রান্ত কোথায় তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে তবে সৌরবায়ু এবং তার মহাকর্ষ শক্তি প্রায় এক আলোকবর্ষ বলে ধারণা করা হয়। এ আকাশের কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ২৭ কিলোমিটার বেগে ২৫ দিনে আপন অক্ষে একবার আবর্তন করে। এই আকাশের পরিসীমা অন্তত এক আলোকবর্ষ।

আল্লাহ তায়ালা নাস্তিক বিজ্ঞানীদের জন্য এ আকাশে একটি চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন। আল-কুরআনে বলেছেন, তিনি যদি দিনকে বিপুল পরিমাপে দীর্ঘায়িত করে দেন তবে তিনি ছাড়া আর কে আছে তা প্রত্যাহার করার। শুক্রগ্রহের দিন তার বছরের চেয়েও দীর্ঘ কারণ এটার আপন অক্ষে একবার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৪৩ দিন এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২২৪ দিন অর্থাৎ শুক্রগ্রহের একদিন পৃথিবীর ২৪৩ দিনের সমান এবং সেখানে সূর্য উঠে পশ্চিম দিকে পৃথিবীর মতো পূর্বদিকে নয়। এখন পৃথিবীর দিনের ব্যাপ্তি যদি কোনো কারণে শুক্রগ্রহের মতো হয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তায়ালা করে দেন তবে বিজ্ঞানীদের কোনো প্রযুক্তি কি সেটা প্রত্যাহার করাতে পারবে ? আর তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়তা দিতে পারেন না যে ভবিষ্যতে এমনটি হবার সম্ভাবনা নেই।

৩. আকাশের তৃতীয় স্তর কিংবা তৃতীয় আকাশ

সূর্যসহ সমস্ত সৌরজগৎ ছায়াপথ বরাবর মিলকি-ওয়ে গ্যালাক্সীর কেন্দ্রকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। এ গ্যালাক্সীর কেন্দ্র থেকে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান ২৫-৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে এবং শেষপ্রান্ত থেকে ৬০ থেকে ৭০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। গ্যালাক্সীটির চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন বাহুতে ৪,০০০ কোটিরও বেশী নক্ষত্র এটার কেন্দ্রকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। বিপুল আকৃতির বিভিন্ন বাহুর মধ্যে সবচেয়ে ছোটবাহুতে অবস্থান করছে আমাদের সৌরজগৎ যার নাম অরিয়ন বাহু এবং এ বাহুর মধ্যে বিশাল আন্ত:নাক্ষত্রিক মেঘে আবৃত হয়ে আছে সৌরজগৎ। আমরা অন্ধকার আকাশে যে ছায়াপথ দেখি সেটা অরিয়ন বাহুর পরবর্তী বাহু। বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে অরিয়ন বাহু সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য বসবাস উপযোগী এলাকা কারণ গ্যালাক্সীর কেন্দ্রীয় এলাকায় নক্ষত্রসমূহ একে অপরের বেশী নিকটবর্তী বিধায় তাদের মহাকর্ষ শক্তি পরস্পরের উপর প্রভাব বেশী এবং দূরবর্তী এলাকায় মহাজাগতিক প্রতিকূল পরিবেশ জীবন ধারণের অনুপোযোগী। অন্যদিকে সূর্যের ও আমাদের গ্যালাক্সীর আকার মধ্যম প্রকৃতির বিধায় এখানে সবকিছু ভারসাম্যজনক অবস্থায় আছে। সৌরজগৎ প্রতি সেকেন্ডে ২২০ কিলোমিটার বেগে গ্যালাক্সীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে এবং সে হিসাবে সৌরজগতের একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২২৫ থেকে ২৫০ মিলিয়ন বছর যাকে বলা হয় এক গ্যালাকটিক বছর। সৌরজগতের বয়স বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন কমবেশী ৫ বিলিয়ন বছর এবং তাই সৌরজগৎ জন্মের পর মাত্র ২৫ থেকে ৩০ বার গ্যালাক্সীকে প্রদক্ষিণ করেছে। একই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্যালাক্সীর সাপেক্ষে সৌরজগতের আপন অক্ষে একবার আবর্তনের নাম হওয়া উচিত এক গ্যালাকটিক দিন কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কিছু বলেন না। তবে আমরা যদি প্লুটোর প্রদক্ষিণ কাল বিবেচনা করি তবে গ্যালাকটিক দিন হবে ২৫০ বৎসর আর যদি সেডনা বামন গ্রহের প্রদক্ষিণ কাল বিবেচনা করি তবে তা হওয়া উচিত ১২,০০০ বছর। যাহোক তৃতীয় আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ৮০,০০০ থকে ১০০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে।

৪. আকাশের চতুর্থ স্তর কিংবা চতুর্থ আকাশ

আমাদের ছায়াপথ বা মিলকি-ওয়ে গ্যালাক্সী আরো কতগুলো গ্যালাক্সীসহ আরো দূরবর্তী একটি কেন্দ্রকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করে যাকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় স্থানীয় গ্যালাক্সীপুঞ্জ বা লোকাল ক্লাষ্টার। আমাদের দৃষ্টিতে এটা আকাশের চর্তুথ স্তর। এ আকাশে আছে আমাদের গ্যালাক্সী, এ্যান্ড্রোমিডা (যা খালি চোখে দেখা যায়),

ম্যাগালিনিক ছোট বড় মেঘসহ বিভিন্ন আকৃতির ৩০টি গ্যালাক্সী। এ্যান্ড্রোমিডা আমাদের থেকে ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। সবগুলো গ্যালাক্সী আমাদের এবং এ্যান্ড্রোমিডার মাঝামাঝি এক অভিকর্ষিক বিন্দুকে ঘিরে আবর্তন করছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা সবগুলো গ্যালাক্সীর বয়স কমবেশী প্রায় ১৩ বিলিয়ন বছর অর্থাৎ সৌরজগতের বয়সের প্রায় ৩ গুণ। আগে আমরা দেখেছি সৌরজগৎ জন্মের পর ২৫ থেকে ৩০ বার গ্যালাক্সী প্রদক্ষিণ করেছে এবং তাই গ্যালাক্সীসমূহ জন্মের পর ৮০ থেকে ৯০ বার লোকাল ক্লাষ্টারের কেন্দ্র ঘিরে প্রদক্ষিণ করেছে বলে ধরা যায়। লোকাল ক্লাস্টারের অভিকর্ষিক কেন্দ্রমুখে আমাদের গ্যালাক্সীর গতি সেকেন্ডে ২২০ কিলোমিটার এবং এ্যান্ড্রোমিডার গতি সেকেন্ডে ১৫০ কিলোমিটার। যাহোক এ আকাশের পরিসীমা প্রায় ১০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

৫. আকাশের পঞ্চম স্তর কিংবা পঞ্চম আকাশ

যে লোকাল ক্লাষ্টারে আমাদের ছায়াপথ অবস্থিত সেটা সহ প্রায় ১০০টি ক্লাষ্টার আরো দূরবর্তী একটি ক্লাষ্টার অভিমুখে আবর্তিত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যাকে বলা হয় ভিরগো ক্লাষ্টার। এটাকে ঘিরে যেসব ক্লাষ্টার পরিভ্রমণ করছে একত্রে তাদেরকে বলা হয় ভিরগো সুপারক্লাষ্টার। এটা আমাদের ছায়াপথ থেকে ৫০ থেকে ৭০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। তাই বলা চলে আমাদের অবস্থান ভিরগো সুপারক্লাষ্টারের প্রান্তিক অঞ্চলে। এটার পরিসীমা প্রায় ২০০ মিলিয়ন আলেকবর্ষ। এটার কেন্দ্রীয় মহাকর্ষ শক্তি এত প্রবল যে কয়েক হাজারেরও বেশী গ্যালাক্সী চারপাশ থেকে এটার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের বিবেচনায় এটাই হল আকাশের পঞ্চম স্তর। আকাশের চতুর্থ স্তরে আমরা দেখেছি গ্যালাক্সী জন্মের পর ৮০ থেকে ৯০ বার আপন অক্ষে আবর্তন করেছে এবং সুপারক্লাষ্টারের সাপেক্ষে এটাকে বলা যায় লোকাল ক্লাষ্টীয় দিন অর্থাৎ লোকাল ক্লাষ্টার জন্মের পর ৮০ থেকে ৯০ দিন অতিক্রম করেছে।

৬. আকাশের ষষ্ঠ স্তর কিংবা ষষ্ঠ আকাশ

বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন ভিরগো সুপারক্লাষ্টার আবার আরো দূরবর্তী একটি কেন্দ্রের দিকে আবর্তিত হয়ে ধাবিত হচ্ছে যার নামকরণ এখনো সঠিকভাবে করা হয়নি শুধু তাকে মহা-আকর্ষি (গ্রেট অ্যাট্রাকটর) বলে অভিহিত করা হয়। এটার সুবিপুল মহাকর্ষের প্রভাবে আমাদের পৃথিবী, সৌরজগৎ, গ্যালাক্সী, লোকাল ক্লাষ্টার, ভিরগো সুপারক্লাষ্টার প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ কিলোমিটার বেগে এটার কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রীয় বলয়ের বরাবর বিধায়

মহাকাশের এ অঞ্চল দূরবীণ যন্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না ফলে বিজ্ঞানীদের কাছে এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণগত তথ্য যথেষ্ট নয়। আমাদের গ্যালাক্সী থেকে এটার দূরত্ব ২৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ, এটার দৈর্ঘ্য ৫০০ মিলিয়ন, প্রস্থ ৩০০ মিলিয়ন এবং পুরুত্ব ১৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। এটার কেন্দ্রীয় বলয়ের অপর পার্শ্ব থেকেও হাজার হাজার গ্যালাক্সী এটার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং সব মিলিয়ে লক্ষাধিক গ্যালাক্সী চারপাশ থেকে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এই মহা-আকর্ষির অকল্পনীয় শক্তির প্রভাবে মহাকাশের এই অঞ্চলে তথাকথিত সম্প্রসারণশীল বিশ্বের সম্প্রসারণ পর্যন্ত অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় স্তিমিত হয়ে পড়েছে। ফলে দূর ভবিষ্যতে আমাদের গ্যালাক্সী এ্যান্ড্রোমিডার সাথে, লোকাল ক্লাষ্টার ভিরগো ক্লাষ্টারের সাথে, ভিরগো সুপারক্লাষ্টার অন্যান্য সুপারক্লাষ্টারের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে ঐ মহা-আকর্ষির কেন্দ্রে পতিত হয়ে ধ্বংসের সম্ভাবনা যথেষ্ট। আমাদের সৌরজগৎ প্রতিদিন ৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার বেগে ঐ মহা-আকর্ষির দিকে এগিয়ে চলছে। এই মহা-আকর্ষিকে ঘিরে যে কয়েকটি সুপারক্লাষ্টার প্রদক্ষিণ করছে তাদেরকে একত্রে অনেকে বলেন সুপারক্লাষ্টার কমপ্লেক্স। বিজ্ঞানীদের ধারণা এটার কেন্দ্রস্থল হাইড্রা-সেন্টারিয়াস ও সেফালী সুপারক্লাষ্টারের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে অবস্থিত। আবার অনেকের মতে এটা গ্যালাক্সীদের সমন্বয়ে গঠিত মহাপ্রাচীর সেন্টারিয়াস প্রাচীরের অন্তর্গত। যাহোক আমাদের বিবেচনায় এটাই হল আকাশের ষষ্ঠ স্তর। মহা-আকর্ষির সাপেক্ষে সুপারক্লাষ্টারের আবর্তন কিংবা প্রদক্ষিণের হিসাব আমাদের জানা নেই এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্রে তা থাকলেও তা আমাদের দৃষ্টির বাইরে আছে। তবে পঞ্চম আকাশে আমরা যে ৮০ থেকে ৯০ দিনের হিসাব পেয়েছি তার ধারাবাহিকতায় বলা যায় এই স্তরে এটার সংখ্যা আরো কম হবে।

৭. আকাশের সপ্তম স্তর কিংবা সপ্তম আকাশ

বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে মহাবিশ্বে সুপারক্লাষ্টারের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। কয়েকটি সুপারক্লাষ্টার মিলে সুপারক্লাষ্টার কমপ্লেক্স কিংবা মহাপ্রাচীরের আকারে সংঘবদ্ধ হয়ে আছে এবং এদের মাঝে রয়েছে বিপুল শূন্যতা অর্থাৎ প্রায় শত মিলিয়ন আলোকবর্ষ। বিভিন্ন স্থানে গ্যালাক্সীদের ক্লাষ্টারসমূহ এমনভাবে সারিবদ্ধ যে দূরবীণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় এককেটি বিশাল প্রাচীর যাদেরকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন মহাপ্রাচীর। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় প্রাচীরের নাম স্লোয়ান মহাপ্রাচীর। এটার দৈর্ঘ্য এক বিলিয়ন আলোকবর্ষেরও বেশী। এটা হাইড্রার মাথা থেকে ভিরগোর পদস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে

হাজার হাজার মহাপ্রাচীর কিংবা সুপারক্লাষ্টার কমপ্লেক্সের সমন্বয়ে অতি দূরবর্তী যে আকাশ সেটাই হলো আকাশের সপ্তম স্তর কিংবা সপ্তম আকাশ। অন্যকথায় আমাদের পূর্ব বর্ণিত আকাশের ছয়টি স্তরের বাইরে বিশাল বিশাল শূন্যতার মাঝে মাঝে যে বিভিন্ন আকৃতির মহাপ্রাচীর কিংবা সুপারক্লাষ্টার কমপ্লেক্সের অবস্থান সেটাই হলো আকাশের সপ্তম স্তর। তবে এ সবের আবার সম্মিলিতভাবে কোনো কেন্দ্রীয় বলয় আছে কিনা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে কোনো তথ্য সে ব্যাপারে পাওয়া যায় না, এমনকি তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানও এ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। বিশেষত: বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে আমাদের জ্ঞান বিলিয়ন আলোকবর্ষ অতীত হয়ে যায়, ফলে সে সম্বন্ধে বর্তমানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ কারো নেই। তবু আমরা মহাকর্ষ শক্তির পরিমাণগত বিভিন্ন স্তর দ্বারা বিন্যাসকৃত আকাশে যে ছয়টি স্তর চিহ্নিত করেছি তার বহির্ভূত মহাকাশীয় অঞ্চলকে সপ্তম আকাশ বলে গ্রহণ করতে পারি।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের সীমা ১৪ বিলিয়ন আলোকবর্ষের বেশী হতে পারে না বলে ধারণা করা হয়। তাই আমাদের অবস্থান সাপেক্ষে বিশ্বজগতকে ধারাবাহিক সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি :

দৃশ্যমান জগৎ ⟶ মহা-আকর্ষি ⟶ ভিরগো সুপারক্লাষ্টার ⟶ লোকাল ক্লাষ্টার ⟶ মিল্কওয়ে গ্যালাক্সী ⟶ সৌরজগৎ ⟶ পৃথিবী।

মহাবিশ্বের বয়স বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন মোটামুটি ১৪ বিলিয়ন বছর (অনেকের মতে ১৩.৭)। স্রষ্টা যদি ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন তবে অনেকে স্রষ্টার ১ দিনকে আমাদের হিসাবের প্রায় ২.২৫ বিলিয়ন বছর বলে ধারণা করে থাকেন। তবে আমরা দেখেছি আকাশের প্রতিটি উচ্চ স্তরে সময়ের ব্যাপ্তির পরিবর্তন ঘটে তাই ৬ দিনের প্রতিটির সময়কাল একই পরিমাপের হবার সম্ভাবনা কম। আকাশের পঞ্চম স্তরে ভিরগো সুপারক্লাষ্টীয় ১ দিন আমাদের ২২৫ থেকে ২৫০ মিলিয়ন বছরের সমান। সে হিসাবে সৌরজগতের বয়স মাত্র ২৫ থেকে ৩০ দিন এবং আমাদের গ্যালাক্সীর বয়স ৭০ থেকে ৮০ দিন। আকাশের ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরের দিন পরিমাপক তথ্য আমাদের হাতে নেই তবু প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম আকাশের প্রাপ্ত হিসাবের ধারাবাহিকতায় বলা যায় সপ্তম আকাশে দিনের সংখ্যা বিশ্বজগতের সাপেক্ষে আরো কম হবে। তাই আমরা বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে বলতে পারি মহাজাগতিক ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টির ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবেও অমূলক নয়।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে সপ্তাকাশ ও জমিন প্রসঙ্গে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে সপ্তাকাশ ও জমিন তিনি সংরক্ষণ করছেন (নিজ ক্ষমতায়) অন্যথায় তারা স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে (আল-কুরআন ৩৫-৪১)। তারা স্থানচ্যুত হয়ে পড়লে তিনি ব্যতিত কেউ নেই তা সংরক্ষণ করার। অর্থাৎ তিনি গ্রহ নক্ষত্র সংরক্ষণ না করলে এরা যার যার স্থানে অবস্থান করবে না, যে যার কক্ষপথে ভ্রমণ করবে না, স্থানচ্যুত হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবে ফলে সারা বিশ্ব বিশৃঙ্খলতায় ডুবে যাবে। এখন এ বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মূল্য বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা যাক :

আমরা এতক্ষণ মহাকাশের স্তর নির্ধারণ করে প্রতিটি স্তরে মহাকর্ষ শক্তির যে বিভিন্ন মাত্রার বর্ণনা দিলাম, তাতে দেখা যায় প্রতিটি উচ্চ স্তরে মহাকর্ষ শক্তির পরিমাণ এত বিপুল পরিমাপে বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় যা নিউটনীয় মহাকর্ষ সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যাপ্ত নয়। অর্থাৎ মহাকাশে দৃশ্যমান পদার্থসমূহের মধ্যে নিউটনীয় গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত মহাকর্ষ শক্তি তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে ধরে রাখার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন মহাকাশে গ্যালাক্সীসমূহের মধ্যে বিভিন্ন নক্ষত্র তাদের কেন্দ্রীয় বলয় থেকে যে বিপুল দূরত্বে যে বেগে ঘূর্ণায়মান তা গ্যালাক্সীর মহাকর্ষ শক্তি তাদেরকে আপন পরিমণ্ডলে ধরে রাখার মতো শক্তিশালী নয়, ফলে নক্ষত্র তাই গ্যালাক্সী থেকে ছিটকে বের হয়ে যাবার কথা অথচ বাস্তবে তা হচ্ছে না। ঠিক একই কারণে লোকাল ক্লাষ্টার কিংবা সুপারক্লাষ্টারের মধ্যে এতগুলো গ্যালাক্সী একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার কথাও নয়।

তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন আরো অন্য কোনো অপ্রাকৃতিক অদৃশ্য শক্তি নক্ষত্র ও গ্যালাক্সীসমূহকে একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে আবর্তন করতে বাধ্য করে এবং ছিটকে বের হতে দেয় না।

এই অদৃশ্য শক্তি বিশ্বের মৌলিক চারটি শক্তির সাদৃশ্যমূলক নয়, ফলে সেটার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কোনো স্পষ্ট জ্ঞান নেই এবং কোনো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এদের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা কেবল মহাকর্ষ শক্তির সাথে কোনো না কোনোভাবে এটার সম্পর্ক আছে, কারণ নক্ষত্রদের গতিতে মহাকর্ষ শক্তির সাথে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আরো কিছু শক্তি সংযোগের প্রয়োজন হয়। তাই বিজ্ঞানীদের প্রথমদিকে ধারণা ছিলো মহাকাশে অনেক কৃষ্ণপদার্থের অস্তিত্ব আছে যারা দৃশ্যমান নয়, অথচ মহাকর্ষ শক্তির সাথে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, তাত্ত্বিকভাবে মহাকাশে যে পরিমাণ কৃষ্ণপদার্থের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব সেটাও নক্ষত্রগুলোকে

গ্যালাক্সীর বিভিন্ন কক্ষপথে ধরে রাখার জন্য পর্যাপ্ত নয়। **তাই বিজ্ঞানীরা বাধ্য হয়ে আরেকটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করছেন যাকে বলা হয় কৃষ্ণশক্তি**। সর্বশেষ হিসাব মতে বিজ্ঞানীরা বলেন বিশ্বে দৃশ্যমান পদার্থিক শক্তির পরিমাণ শতকরা ৪ ভাগ, কৃষ্ণ পদার্থিক শক্তি ২৩ ভাগ এবং কৃষ্ণশক্তি ৭৩ ভাগ। অনেকে আবার দৃশ্যমান পদার্থিক শক্তিকে ৪ ভাগের বদলে ১ ভাগ স্বীকারের পক্ষপাতি। এই কৃষ্ণশক্তি এমন এক অপ্রাকৃতিক শক্তি যা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের বিশেষ স্পষ্ট ধারণা নেই অথচ তা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

অন্যদিকে কোন্ শক্তি মহাবিশ্বকে সম্প্রসারিত করতে বাধ্য করছে সেটাও বিজ্ঞনীদের কাছে বিরাট প্রশ্ন। বস্তুত আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করছি যার কার্যপ্রণালীর সিংহভাগ শক্তি সমন্ধে বিজ্ঞানীদের সূত্রাবলি বিনিশ্চায়কভাবে তথ্য দিতে অপারগ অথচ সেসব সূত্রাবলি দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সার্বিক কার্যক্রমের ব্যাখ্যা করতে তারা উৎসাহী। বিশ্বস্রষ্টা বলছেন তিনি বিশেষ ক্ষমতায় সপ্তাকাশ ও জমিন সংরক্ষণ করছেন অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিপথের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করছেন, ফলে তারা আপন কক্ষপথ থেকে স্থানচ্যুত হয় না। **বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন তাদের সূত্রাবলি বিশ্বের সমুদয় শক্তি ও পদার্থের কেবল মাত্র ক্ষুদ্র অংশের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম এবং বৃহত্তম অংশের কার্যক্রম তাদের কাছে অবোধগম্য অথচ এই স্বল্প অংশের বোধগম্যতার জ্ঞান দিয়ে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব ও তার কার্যাবলির ব্যাখ্যায় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অযৌক্তিকভাবে তারা সন্দিহান।**

বস্তুত অতি ক্ষুদ্র স্তরে পারমাণবিক জগতে বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের বিনিশ্চায়কের সীমা হাইজেনবার্গীয় অনিশ্চয়তা সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ, ফলে সে সীমার অতীতে পদার্থিক জ্ঞান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা দাবী করেন বৃহত্তর স্তরে তাদের জ্ঞান যথেষ্ট সুনিশ্চায়ক এবং স্বচ্ছ। কিন্তু আমরা দেখেছি এই বৃহত্তর স্তরকে অতি বৃহত্তম পর্যায়ে নিয়ে গেলে বিজ্ঞানীদের পদার্থিক জ্ঞান আবার অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হয়। তবে বিজ্ঞানীরা এ পরিস্থিতিকে এখনো কোনো গাণিতিক সূত্র দ্বারা প্রকাশ করেননি, শুধু দূরকল্পনের পর দূরকল্পন অব্যাহত রেখেছেন।

আকাশের প্রথম স্তর কিংবা প্রথম আকাশ

আকাশের দ্বিতীয় স্তর কিংবা দ্বিতীয় আকাশ

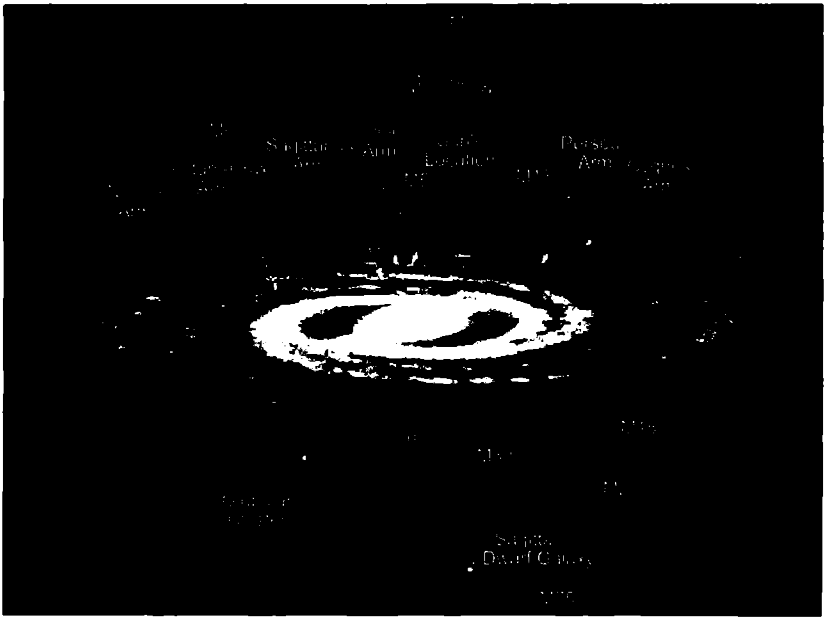

আকাশের তৃতীয় স্তর কিংবা তৃতীয় আকাশ

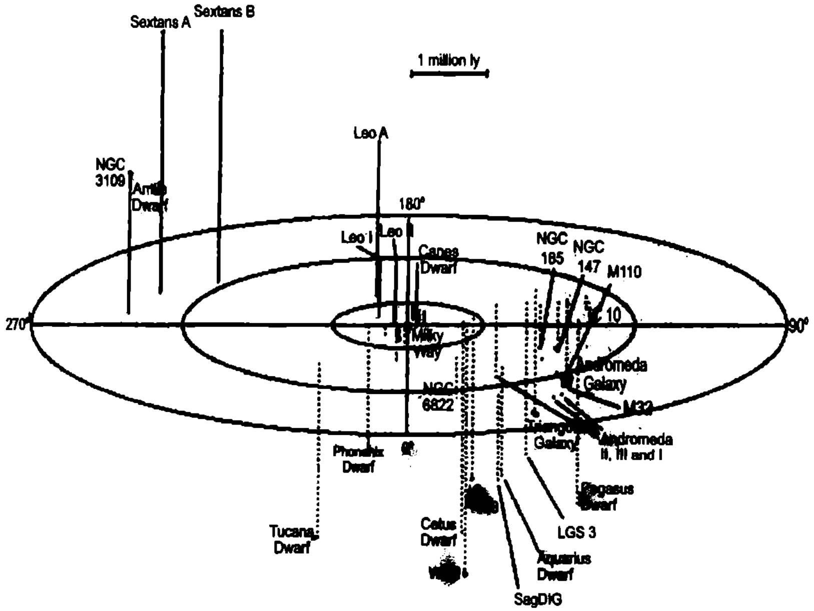

আকাশের চতুর্থ স্তর কিংবা চতুর্থ আকাশ (লোকাল ক্লাষ্টার)

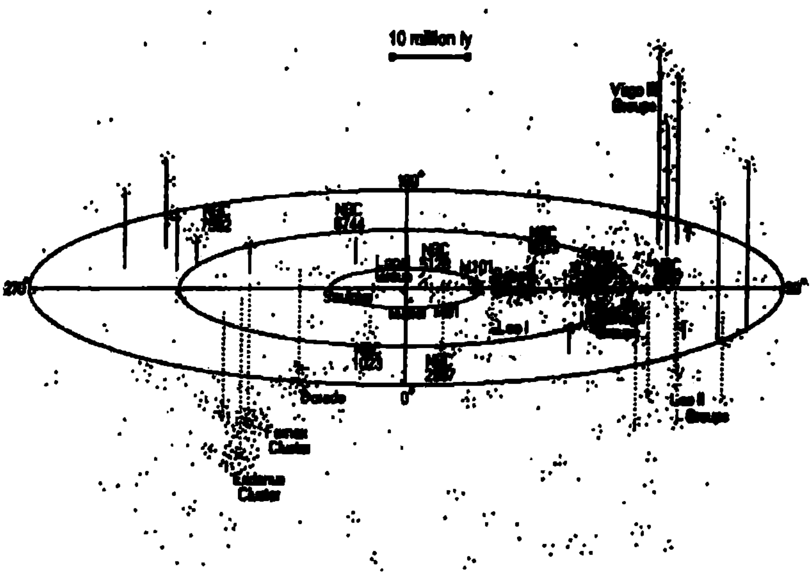

আকাশের পঞ্চম স্তর কিংবা পঞ্চম আকাশ (ভিরগো সুপারক্লাষ্টার)

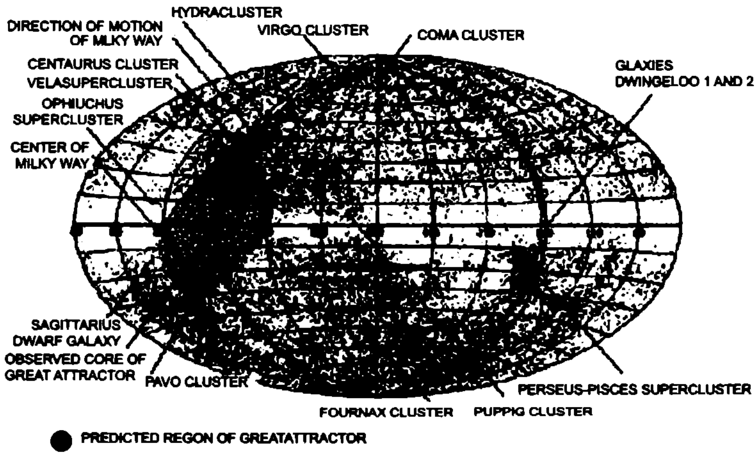

আকাশের ষষ্ঠ স্তর কিংবা ষষ্ঠ আকাশ

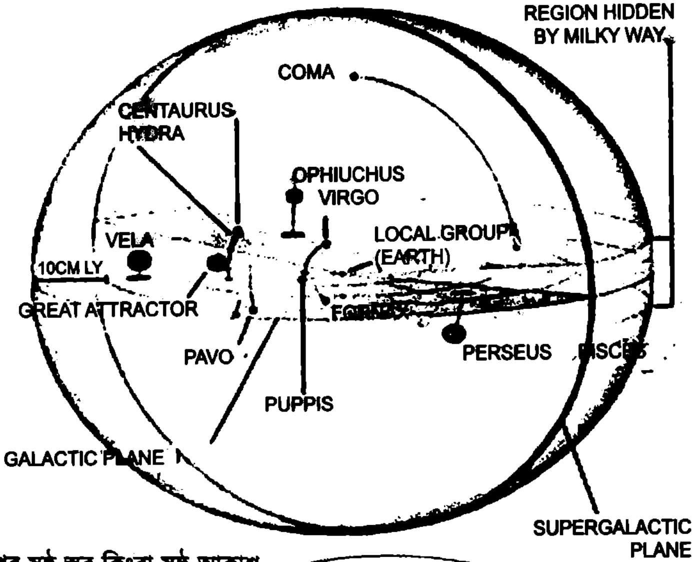

আকাশের ষষ্ঠ স্তর কিংবা ষষ্ঠ আকাশ

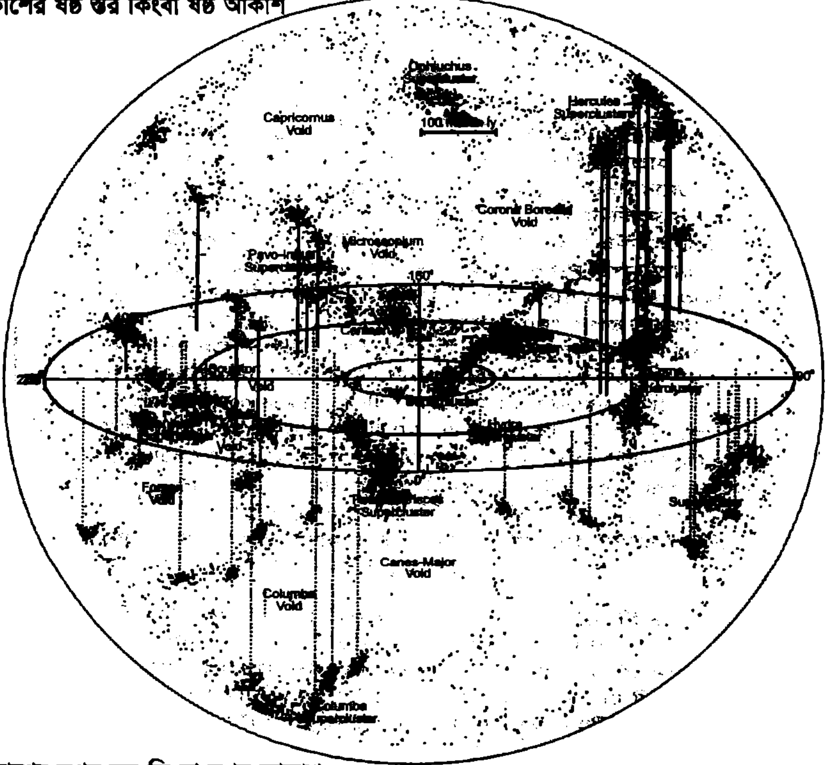

আকাশের সপ্তম স্তর কিংবা সপ্তম আকাশ

ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি ও বিজ্ঞানীদের উভয় সংকট

মহাবিশ্বের অস্তিত্ব লাভ কিংবা সৃষ্টির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ যে ভাষায় উপস্থাপন করা হয় শাব্দিক অর্থগতভাবে তা ত্রুটিপূর্ণ এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকৃতির মধ্যদিয়ে বিশ্বসৃষ্টির জন্য যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বর্তমানে শোভা বর্ধন করছে তার মূল ভিত্তি হলো প্রাগৈতিহাসিক গ্রীক হেত্বাভাসপূর্ণ দার্শনিক পরিভাষার অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ এক্স-নিহিলো (Exnihilo) যার অর্থ হলো শূন্য থেকে সৃষ্টি এবং এটার গাণিতিক প্রকাশ হলো প্রাচীন ভারতীয় গণিতের আবিষ্কার '০' (শূন্য) প্রতীক। যদিও এ তত্ত্বের মূলে ঈশ্বর তত্ত্ব জড়িত ছিলো কিন্তু বর্তমান তা বিজ্ঞানীদের হাতে পরিবর্ধিত হয়ে এখন এটার আধুনিক রূপ হলো ঈশ্বরবিহীন শূন্যতা থেকে বিশ্ব সৃষ্টি। এ রকম একটি অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন এবং বিশ্ব সৃষ্টি ও কার্য পরিচালনায় ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিশ্বকে মুক্তির দাবী করে পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণাধীন ভেবে পুলকিত বোধ করছেন। কিন্তু মধ্যযুগে মুসলিম মুতাকাল্লিমগণ তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছেন প্রকৃত শূন্যতা অর্থহীন এবং অস্তিত্ববিহীন এবং বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষায় যখন প্রমাণ হলো শূন্যস্থান আসলে শূন্য নয় বরং সেখানে বিশিষ্ট প্রকার শক্তিপ্রবাহ বিদ্যমান, তখন এ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অর্থ হলো তারা একটি বিশিষ্ট সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন যার নাম হলো শূন্যতা কিন্তু বস্তুত তা শূন্য নয় (Scientists discovered something named nothing)।

যদিও আব্রাহামিক ধর্মের কোনো ধর্মগ্রন্থে, তালমুদ, বাইবেল ও আল-কুরআনের কোথাও স্পষ্টভাবে শূন্য থেকে বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়নি এবং এ জাতীয় পরিভাষাও নেই তবু ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমপাড়ের ধর্মগ্রন্থবিহীন সভ্যতা ও পূর্বপাড়ের ধর্মগ্রন্থধারী সভ্যতার আন্তঃসংমিশ্রণে এটা ধর্মীয় পরিমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করে। যদিও এটা আক্ষরিকভাবে চরম অর্থহীনতা নির্দেশ করে তবু সময়ান্তরে এ অর্থহীনতাই বুদ্ধিজীবি মহলে একটি অর্থবোধক সত্তায় পরিণত হয়। এদিকে আব্রাহামিক ধর্মের তিনটি ধর্মগ্রন্থে বিশ্ব সৃষ্টির জন্য ঐশ্বরিক ছয় দিনের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু ঐশ্বরিক ছয়দিনের সাথে পার্থিব দিনের সময়ের পরিমাণগত পার্থক্য ও মূল্যের কথা বলা হয়নি। বাইবেলে আভাস ইঙ্গিতে এবং কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে ঐশ্বরিক দিন পার্থিব দিনের সমতুল্য নয়। কুরআনিক ভাষায় আল্লাহর

একদিন মানুষের সর্বোচ্চ ধারণাগত দিনের মূল্যমানের পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী। হাজার হলো আরবী ভাষায় সর্ব্বোচ্চ গাণিতিক মূল্য। প্রাচীনকালে একদিনের সর্বোচ্চ সময় বুঝাতো একদিনে একটি দ্রুততম ঘোড়া যতদূর অতিক্রম করতে পারে। বর্তমানে এটা হলো আলো একদিনে যতদূর অতিক্রম করতে পারে। সে হিসেবে মানুষের কাছে এক বছরের সর্বোচ্চ বোধগম্য দূরত্ব হলো এক বছরে আলো যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে যাকে বলা হয় আলোকবর্ষ। যদিও বিগত শতাব্দীর প্রথম দশকে আইনস্টাইন আলোর গতিকে সর্বোচ্চ গতির ধ্রুবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালান কিন্তু তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে মহাকর্ষ বলের গতিবেগ বিশ্বের জন্য চরম ও সর্বোচ্চ গতি বলে প্রমাণিত হয় এবং এটার ন্যূনতম গতিবেগ হলো আলোর গতির বিলিয়ন গুণ বেশী। তাই বর্তমান বিশ্বের বয়স আলোর গতিবেগ দ্বারা পরিমাপ করলে এটা হয় কমবেশী ১২ থেকে ১৫ বিলিয়ন বছর এবং এটাকে মহাকর্ষের গতিবেগ দ্বারা পরিমাপ করলে এটা হবে মহাজাগতিক ১২ থেকে ১৫ দিন। মহাকর্ষ বলের গতিবেগকে অনেকে আলোর বিলিয়ন গুণের চেয়েও শতগুণ কিংবা হাজার গুণ বেশী বলে মনে করেন। আমরা যদি এটাকে কেবল দ্বিগুণ বেশী বলে গ্রহণ করি তবে বিশ্বের বয়স হবে ৬ থেকে ৭ দিন। তবে বিশ্বের বর্তমান বয়স ও মহাকর্ষ বলের গতিবেগ বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো চূড়ান্ত নয়। আমরা রাব্বুল আলামিন শিরোনামের অধ্যায়ে যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেছি। **মহাকর্ষ বল হলো আল্লাহর নূরের উপজাত শক্তি এবং তাই এটার গতিবেগ আল্লাহর নূরের গতির গতিবেগের উপজাত এবং তার হিসাবের একটি পরিমাপক।**

এদিকে স্রষ্টা কর্তৃক ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি আর বিশ্বের বয়স সমার্থক নয়। ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি বলতে বুঝায় বিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু থেকে পৃথিবীতে জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবার সময়কাল পর্যন্ত আর বিশ্বের বয়স বলতে বুঝায় বিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। **একটি জীব বা মানুষের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, তার সৃষ্টি কাল হলো এককোষী ভ্রূণ থেকে মাতৃগর্ভে পূর্ণ বিকশিত হয়ে জন্মগ্রহণের সময় পর্যন্ত এবং তার বয়স হলো মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর থেকে তার বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। যদিও এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ থাকা উচিত নয়, তবু এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্তির শেষ নেই।**

সৌরজগতের উৎপত্তির বিষয় বর্ণনায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে পরস্পর অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, বিবর্তনবাদী জৈববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান। এসব বিজ্ঞানের সমন্বয়হীনতার ফলে পৃথিবীর সাথে সূর্যের বয়সের তারতম্য সুস্পষ্ট এবং সৌরজগৎ উৎপত্তির বর্ণনায় একক কোনো তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। বিগত দুই শতাব্দীর বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যের বয়স যা নির্ধারণ করেন, ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের নির্ধারিত পৃথিবীর বয়স তার চেয়ে বেশী। বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেও এ অসংগতি দূর তো হয়নি বরং আরো বেড়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অন্ধবিশ্বাস হলো সূর্যের চেয়ে পৃথিবীর বেশী বয়স গ্রহণযোগ্য নয় এবং একারণে বিশ্বের প্রতিটি বিজ্ঞান গ্রন্থে বর্ণনা আছে যে পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর এবং সূর্যের বয়স পৃথিবীর চেয়ে অন্তত কয়েকশত মিলিয়ন বছর বেশী। কারণ পৃথিবী হলো সূর্যের একটি বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ মাত্র। তারা সূর্যের বয়স পরিমাপ করেন হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামের পারমাণবিক বিক্রিয়ার অনুপাত থেকে এবং পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেন তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম থেকে সীসার রূপান্তরের অর্ধজীবনের আনুপাতিক হিসাব থেকে এবং এ দুটো অনুপাতের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক কোথায় তার যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু বলেন না।

অথচ বিজ্ঞানীদের গৃহিত তত্ত্বে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম এবং ভারী মৌলকণা তৈরী হতে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয় এবং সূর্য ভারী মৌলকণা উৎপাদনে সক্ষম নয়, এমনকি বিপুল আকৃতির সুপারনোভায় কেবল লৌহ পর্যন্ত ভারী কণা উৎপাদন সম্ভব এবং আরো বেশী ভারী মৌলকণা কিভাবে সৃষ্টি হলো এবং পৃথিবীতে তার উপস্থিতি কিভাবে সম্ভব হলো সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যৌক্তিকভাবে কিছু বলছেন না। ইউরেনিয়ামের অর্ধজীবন গণনা করে বিজ্ঞানীরা বলছেন পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশত কোটি বছর এবং এ বক্তব্যের আক্ষরিক অর্থ হলো সাড়ে চারশত কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর আদি কাঠামোর শিলায় ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি ছিলো মাত্র। পৃথিবীর মূল বয়স আরো বেশী এবং এ বয়স ইউরেনিয়ামের উৎপত্তির ইতিহাসের সাথে জড়িত। এদিকে পৃথিবী যদি সূর্যের একটি বিক্ষিপ্ত অংশ হয়ে থাকে তবে সেখানে লৌহসহ অন্যান্য ধাতব পদার্থ ও ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি থাকা সম্ভব নয়, কারণ সূর্যের মূল উপাদান হলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় বলয়ের মূল উপাদান হলো লৌহ-নিকেল, পক্ষান্তরে সূর্যের কেন্দ্রীয় বলয় হলো হিলিয়াম। বিজ্ঞানীদের বর্ণনা

অনুসারে লৌহসহ ভারী ধাতব পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে সৌরলোক পূর্ব বিপুল আকৃতির সুপারনোভা বিস্ফোরণে এবং সেটার ধ্বংসাবশেষ হলো পৃথিবীতে উপস্থিত ভারী মৌলকণা। অতএব এসব ভারী মৌলকণার বয়স আরো কয়েক বিলিয়ন বছর বেশী।

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে পৃথিবীতে উপস্থিত ইউরেনিয়ামের প্রকৃত বয়স ন্যূনতম ছয় বিলিয়ন বছর। আর হাইড্রোজেন বিক্রিয়ায় হিলিয়ামের রূপান্তরের হিসাবে সূর্যের বয়স তিন থেকে চার বিলিয়ন বছর। কিন্তু বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা তাদের তত্ত্বের স্বার্থে পৃথিবীর বয়স কমিয়ে সূর্যের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছেন, তবু প্রকৃত সমস্যা এতে দূর হয়নি। কারণ তিনশত কোটি বছর পূর্বে সূর্যের তাপমাত্রা ছিলো বর্তমানের চার ভাগের তিন ভাগ এবং পৃথিবী তখন পূর্ণ বিকশিত পাহাড় পর্বতে সাগরে পূর্ণ ও জীবনের বিকাশে অন্তত এককোষী জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু তখন অবিকশিত সূর্যের তাপমাত্রা পৃথিবীর জীবন বিকাশের জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ সূর্যের তাপ কম থাকলে পৃথিবীতে তরল পানি থাকা সম্ভব নয় এবং তরল পানি ছাড়া জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সূর্যের তাপ বাদেও পৃথিবীতে তখন জীবনের বহুমুখী বিকাশের জন্য অন্য কোনো শক্তির উৎস ছিলো কিংবা সূর্যের আকার বর্তমানের তুলনায় বড় ছিলো এবং তার ফলে তাপমাত্রা বর্তমানের সমান ছিলো। কিন্তু এ রকম ধারণাও সূর্যের তারুণ্যতার নির্দেশক। বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও সূর্যের বয়স নির্ধারণে উভয় সংকটে পড়েছেন।

বিজ্ঞানীদের এ উভয় সংকট থেকে পরিত্রাণ দিতে আমরা বিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কুরআনিক ছয় দিনের বর্ণনায় ফিরে যাব। আল-কুরআন ছয়দিনকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছে : প্রথম দুইদিনে আসমানসহ পৃথিবীর আদিরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে, পরবর্তী চার দিনে পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি, তার বিকাশ ও বহুমাত্রিক জীবের আবির্ভাব, তাদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা তথা বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য, পাহাড় পর্বতের স্থিতিশীলতা এবং মানবীয় জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা যখন প্রথম দু'দিনে পৃথিবীর প্রাথমিক গঠন সৃষ্টি করেন তখন পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ ছিলো কুরআনিক ভাষায় ধূমায়িত, বৈজ্ঞানিক ভাষায় তপ্তগ্যাসীয় পিণ্ড বা হাইড্রোজেন-হিলিয়াম পিণ্ড এবং এটাই হলো সূর্যের আদি কাঠামো। (আল কুরআন, সূরা : ৪১, আয়াত : ৯-১২)

এমতাবস্থায় বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হলো সৌরলোক পূর্ব ও বিশ্ব সৃষ্টির প্রথমধাপে হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ অতি বৃহদায়তন প্রথম প্রজন্মের গ্যালাক্সীর কেন্দ্রীয়

অঞ্চল বিপুল তেজে সূর্যের চেয়ে লক্ষ-কোটি বেশী শক্তিতে পারমাণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হিলিয়ামসহ ভারী সব মৌলকণা উৎপাদন করে এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিঃশেষ হয়ে যায়এ চারদিকে বিভিন্ন মৌলকণার সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষের টুকরো টুকরো ভগ্নাংশ বিক্ষিপ্ত হয়। এতে ভারী মৌলকণা কার্বন, অক্সিজেন থেকে শুরু করে লৌহ, নিকেল ইউরেনিয়ামসহ ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এরাই হলো গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জের আদি রূপ এবং অব্যবহৃত হাইড্রোজেন হিলিয়ামের গ্যাসীয়পিণ্ড হলো সূর্যসহ নক্ষত্রের আদি কাঠামো। অনেক বিজ্ঞানী আবার এটাকে দুই ধাপে বিভক্ত করতে চান : প্রথমে আদি গ্যালাক্সী থেকে বিপুল আকৃতির নক্ষত্র কিংবা নেবুলা এবং সেটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে গ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ এবং তার অব্যবহৃত হাইড্রোজেন হিলিয়াম থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের নক্ষত্র যেমন সূর্য। বস্তুত গ্যালাক্সীর কেন্দ্রস্থলে কি ঘটছে তা এখনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট নয়।

বিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু থেকে পৃথিবীতে উন্নতজীব তথা মানব জীবনের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিকালকে যদি আমরা গাণিতিকভাবে ৬ টি পর্যায়ে বিভক্ত করি তবে পৃথিবীর আদি কাঠামো সৃষ্টির সময় হবে বিশ্বের বয়সের ২/৬ বা ১/৩ অংশ এবং পৃথিবীর আদি কাঠামো থেকে জীবন সৃষ্টি ও তার বহুরূপী বিকাশ ও খাদ্য যোগান তথা পৃথিবীর জলবায়ুগত ভারসাম্য সৃষ্টি করার অতিবাহিত সময়কাল হলো বা পৃথিবীর বয়স হলো বিশ্বের বয়সের ৪/৬ বা ২/৩ অংশ। কিন্তু বিজ্ঞানীদের বর্ণনা অনুসারে পৃথিবীর বয়স বিশ্বের বয়সের ১/৩ অংশ কারণ তাদের বর্ণনায় বিশ্বের বয়স প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন এবং পৃথিবীর বয়স ৪.৬ বিলিয়ন বছর। অর্থাৎ কুরআনিক বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানীদের বর্ণনায় ১/৩ অংশ অসংগতিপূর্ণ। এটাকে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর বয়সের পরিমাপে বিজ্ঞানীদের হিসাবের বাদ পড়ে যাওয়া অংশ (Missing link)। এ অংশটুকু সম্ভবত সূর্যের মূল বয়সের সাথে সম্পর্কিত।

আমরা অন্যত্র প্রস্তাব করেছি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সংঘটিত হয়েছিল বিগ ব্যাংগ প্রক্রিয়ায় নয় বরং পদার্থবিহীন শক্তিময় স্থানিক কাঠামোতে এবং তরল জাতীয় অতি শীতল সত্তা থেকে এবং আলোর চেয়ে বিলিয়ন গুণ বেশী গতিবেগে এবং পরে স্থানিক কাঠামোর বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্ষেত্রে একই সাথে নিহারিকা গ্যালাক্সীর বিকাশ শুরু হয়েছিল। তাই হাবল ধ্রুবক দিয়ে বিশ্বের বয়স পরিমাপণের চেষ্টা অর্থহীন।

পৃথিবী সৃষ্টির সাথে চন্দ্রের সৃষ্টির ইতিহাস অপরিহার্য সম্পর্ক আছে এবং অধিকাংশ

বিজ্ঞানী একমত যে চন্দ্র কমবেশী চারশত কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর একটি অংশ ছিলো। সে সময় একটি কক্ষচ্যুত গ্রহাকৃতির বস্তুপিণ্ড পৃথিবীতে আঘাত করে চলে যায় এবং ফলে পৃথিবী থেকে একটি অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবী আবর্তন শুরু করে এবং এটাই হলো আদি চন্দ্র। কিন্তু গ্রহাকৃতির যে বস্তুপিণ্ড পৃথিবীকে আঘাত করেছিল বর্তমানে সেটা কোথায় অবস্থান করছে সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের কাছে তেমন কোনো তথ্য নেই। তবে অনেক গবেষকের মতে সেটার মূল অংশ হলো পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে চন্দ্রাকৃতির যে ধাতব লৌহ-নিকেল পিণ্ড আছে যা পৃথিবীর আবর্তনের চেয়ে কিছু বেশী বেগে আবর্তন করছে। আদি পৃথিবীর সাথে এ লৌহ আকরিক পিণ্ডের সংঘর্ষে প্রচুর পরিমাণ মুক্ত অক্সিজেন নির্গত হয়েছিল যা হাইড্রোজেনের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার পানি উৎপন্ন হয়। ফলে প্রায় চারশত কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে তরল পানির অস্তিত্ব ও তিনশত কোটি বছর পূর্বে সাগর সৃষ্টি হয় এবং সেখানে থেকে জীবন বিভিন্ন মাত্রায় বিকশিত হতে থাকে।

যদিও পারমাণবিক বিক্রিয়া আবিষ্কারের পর পরই তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দেন যে সূর্যে অবিরাম হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার হিলিয়াম রূপান্তরের মাধ্যমে সূর্য আলো বিতরণ করছে তবু বিষয়টি এখনো পরীক্ষিত নয়। এ ধরনের বিক্রিয়া অবিরাম সংঘটনের জন্য সূর্যের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ তাপ, চাপ ও ঘনত্ব থাকা উচিত পর্যবেক্ষণে তা পাওয়া যাচ্ছে না এবং এ বিক্রিয়া সংঘটনে যে পরিমাণ নিউট্রিনো কণিকা বিচ্ছুরণ হওয়া উচিত পর্যবেক্ষণে সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যে হারে ভারী কণার সঞ্চিত হওয়া উচিত সে পরিমাণে উপস্থিত নেই। উপরন্তু সূর্যে লিথিয়াম ও বেরিলিয়ামের উপস্থিতি প্রমাণ করে তার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা চার পাঁচ মিলিয়ন ডিগ্রীর বেশী হবার সম্ভাবনা কম এবং কোনক্রমেই এ তাপমাত্রা প্রত্যাশিত ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রী হতে পারে না। এটার অর্থ হলো সূর্য তুলনামূলকভাবে তরুণ।

পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক ও জৈব-রাসায়নিক ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় পৃথিবী অস্তিত্ব লাভের মাত্র কয়েকশত মিলিয়ন বছরের মধ্যেই জীবনের প্রাথমিক রূপের আবির্ভাব ঘটেছিল যা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বিবর্তনবাদী তত্ত্বেও এত স্বল্প সময়ে অজৈবিক রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবনের অস্তিত্ব লাভ গাণিতিক হিসাবেও অসম্ভব। তাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের সমন্বয়ে জীবনের ন্যূনতম উপাদান সৃষ্টির বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনা থাকলেও পরিসংখ্যানগতভাবে তার জন্য আরো কয়েক বিলিয়ন বছর সময়ের প্রয়োজন।

সময়ের এ অসামঞ্জস্যতা কোনো অলৌকিক সত্তার সুপরিকল্পিত ইচ্ছা ও পৃথিবীর সুদীর্ঘকালিন অস্তিত্বের নির্দেশ করে। জীবন সৃষ্টির আয়োজন বিশ্ব সৃষ্টির শুরুর মুহূর্ত থেকে চলতে থাকে কিন্তু বিজ্ঞানীরা সময়ের এ সুদীর্ঘ ব্যাপ্তির অসামঞ্জস্যতা পরিহার করতে জীবন সৃষ্টিকে পৃথিবীর বাইরে আন্তঃনাক্ষত্রিক ধুলাবালিতে সংঘটিত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এতেও বৈজ্ঞানিকভাবে সমস্যা দূর হয়নি বরং আরো জটিল হয়েছে। কারণ সম্ভাবনা সূত্র ও পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় অজৈবিক বিভিন্ন মৌলকণার সংমিশ্রণে কেবল জীবন ধারণের জৈবিক গঠনের প্রাথমিক কাঠামো তৈরী হতে বিশ্বের বয়সের চেয়ে অনেক গুণ বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। এত অসামঞ্জস্যতা, এত বিপরীতমুখী তত্ত্ব, এত জটিলতা এবং এত দুর্বোধ্যতা পরিহার করতে কেন বিজ্ঞানের রাজ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকৃতির প্রবেশ নিষেধের বৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক নীতিমালা বাতিল যোগ্য হবে না তার সঠিক উত্তর খণ্ড বিখণ্ড বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার কারো কাছে প্রত্যাশা করাও অবান্তর।

বিজ্ঞানীরা স্রষ্টাবিহীন বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যায় ব্যর্থ, স্রষ্টাবিহীন পৃথিবী উৎপত্তি লাভের ব্যাখ্যায় ব্যর্থ, স্রষ্টাবিহীন জীবনের বিকাশ লাভের ব্যাখ্যায় ব্যর্থ, স্রষ্টাবিহীন মানব অভ্যুদয়ের ব্যাখ্যায় ব্যর্থ, এমনকি স্রষ্টাবিহীন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল কারণ ব্যাখ্যায় ব্যর্থ। এত ব্যর্থতা আড়াল করতে তারা পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন তত্ত্বের পর তত্ত্বের বোঝায় জ্ঞানমন্দিরকে ভরে তুলেছেন। ফলে তত্ত্ব ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক অতিরিক্ত বোঝা ভারে অস্থির এবং সে অস্থিরতায় চৈতন্যবোধ আর প্রকৃত সত্য অন্বেষণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। **প্রাচীনকালে বিজ্ঞান ছিলো প্রকৃতির মধ্যে স্রষ্টার সার্বভৌম ইচ্ছার কার্যকারিতার বোধগম্যতার প্রয়াস কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান হলো স্রষ্টাকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে পদার্থিক বিশ্বের অস্তিত্ব ও কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যার প্রয়াস। এটাকে বলা যায় বিজ্ঞানের চৈতন্যবোধের অবক্ষয়।** যেসব সচেতন জ্ঞানী গুণীজন এ প্রবণতার ব্যাপারে দূরদর্শী তাদের কাছে বিজ্ঞান এখন অবধারিত দুঃখজনক মৃত্যু পথযাত্রী রুগ্ন কলেবর মাত্র।

মহাবিশ্বের বয়স ও আয়তন কত তার বৈজ্ঞানিক হিসাব বস্তুনিষ্ঠ নয় বরং তাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার বাইরে যে ধর্মীয়-সামাজিক পরিবেশে যে বিশ্বজাগতিক বিশ্বাসের ভিত্তি রচিত হয় সেটা তার অচেতন প্রকাশ মাত্র এবং সে বিশ্বাসের অনুকূলের বক্তব্যকে তারা বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রকাশ করে সত্য বলে গ্রহণযোগ্য

করার চেষ্টা করছেন। এজন্য তারা প্রয়োজনবোধে তাদের তাত্ত্বিক গাণিতিক পরিমাপকে কমবেশী করছেন। **বিজ্ঞান যদি তার তত্ত্বসমূহকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক কাজের উন্নয়নে সীমাবদ্ধ রাখে তবে সেটাই হবে বাস্তবসম্মত কিন্তু ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।**

মূল স্রোতধারার বিজ্ঞানী এবং বিবর্তনবাদীরা কিছু বৈজ্ঞানিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে জনসম্মুখ থেকে আড়াল করছেন তাদের নাস্তিক্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এবং তাদের অন্যতম একটি হলো বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলির সঠিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত সত্য যে সূর্যের চেয়ে পৃথিবীর বয়স বেশী এবং এ দু'টোর গঠন কাঠামোতে কোনো সাদৃশ্য নেই এবং পৃথিবী সূর্যের বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ হতে পারে না, প্রচলিত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য জ্ঞান অর্জনের পথে কালিমা লেপন মাত্র। কারন সেসব তথ্য তাদের নাস্তিক্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে উদ্ভাবিত ও গাণিতিক ভাষায় প্রকাশিত এবং বিজ্ঞানের পরিচয়ে অপবিজ্ঞানের কল্পকথা মাত্র।

বিজ্ঞানের প্রতীমা পূজা

বিশ্বজগতের প্রভু, প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য পথনির্দেশক ও যাবতীয় সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যেন মানুষ স্পষ্টভাবে সত্য ও মিথ্যাকে উপলব্ধি করে সত্য ও ন্যায়কে গ্রহণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ প্রয়াসের ক্ষেত্রে ইসলাম সবচেয়ে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করেছে সর্বস্তরের প্রতীমা পূজাকে, কারণ এটা মানুষকে সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণের প্রবণতাকে উৎসাহিত করে, মিথ্যাকেই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যাদেরকে প্রতীমা হিসেবে পূজা করা হয় তাদের ব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কমবেশী সত্যনিষ্ঠ হিসেবে পরিগণিত হলেও সময়ের সাথে সাথে সেখানে মিথ্যার ধূলিকণা জমা হতে থাকে এবং স্বল্প সময়েই তা সত্যমিথ্যার সাথে এমন সংমিশ্রিত সত্তা হিসেবে রূপ লাভ করে যে সেখানে সত্যের চেয়ে মিথ্যাই প্রকট হয়ে উঠে। সত্যমিথ্যার এমন সংমিশ্রিত সত্তার গ্রহণযোগ্যতাই প্রতীমা পূজার প্রতীক।

ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসে সীমাবদ্ধ না থেকে এটা এখন জ্ঞান অন্বেষণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে এবং সেখান থেকে যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের প্রসার ঘটছে তা অধিকাংশ সত্যমিথ্যায় সংমিশ্রিত এবং তা পৃথককরণের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ নেই বললেই চলে। **কারণ বর্তমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের বর্ণনা এমন হয়ে পড়েছে যে বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলের বাইরে সেসব নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার ও সাহস যেন কারো নেই।** প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে সত্য আবিষ্কারের চৈতন্যে উজ্জীবিত অনেক আত্মত্যাগী জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানী নিজের জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে সত্যমিথ্যার সংমিশ্রণের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে চলছেন। আমরা এটাকে প্রতীমা পূজা বলে অভিহিত করব এবং তাদের সত্য অন্বেষণে কিভাবে অসত্য মিশ্রিত হচ্ছে সেদিকে আলোকপাত করব।

বিজ্ঞানকে সঙ্গায়িত করা হয় প্রাকৃতিক বিশ্ব সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সঠিক বোধগম্যতার প্রয়াস এবং সে প্রয়াসকে সহজবোধ্য সূত্রে প্রকাশ। **বিজ্ঞানের আক্ষরিক অর্থ হলো বিশেষ জ্ঞান : বিশেষ একটি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে আবিষ্কৃত একটি সত্য যা সেই ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত।** ক্ষেত্র ছাড়া বিজ্ঞান হতে পারে না এবং ক্ষেত্র বহির্ভূত বিজ্ঞান সত্য হতে পারে না। যে ক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে একটি তথ্যগত প্রক্রিয়া বিশেষ

শর্ত সাপেক্ষে সত্য হয় সেটা হলো সে ক্ষেত্রের বিজ্ঞান। ফলে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যতা সেই স্থান ও কালের ক্ষেত্রে সত্য ও বাস্তব। কিন্তু জ্ঞানের সাধারণকরণের নামে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে তার স্থান ও কালের ক্ষেত্রের উর্ধ্বে নিয়ে চিরন্তন সত্যের পরিচয়ে প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রসীমা লঙ্ঘনের কাজ। কোনো **বৈজ্ঞানিকের এ অধিকার নেই একটি ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে ক্ষেত্র বহির্ভূত ও শর্তবিহীনভাবে প্রকাশ করা। এটা করলে সেটা আর বিজ্ঞান থাকে না, সেটা হয়ে পড়ে দূরকল্পন যার সত্যতার নিশ্চয়তা বিজ্ঞান নিজেই দিতে পারে না। এমতাবস্থায় সত্য অসত্যের সংমিশ্রণ ঘটে এবং একটি স্থানিক সত্যকে চিরন্তন সত্যের নামে প্রকাশের প্রচেষ্টায় সেখানে সত্যের অপলাপ হয় এবং বিজ্ঞান প্রতীমা পূজায় পরিণত হয়।**

বস্তুত জ্ঞানের সাধারণকরণের দায়িত্ব বিজ্ঞানের নয়। বিজ্ঞানীদের একেকটি অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য স্থান ও কালের উর্ধ্বে নিয়ে অভিজ্ঞতা পূর্ব সত্য হিসেবে প্রকাশের দাবী করলে বিজ্ঞান নিজের অজ্ঞাতে একটি প্রতীমা নির্মাণ করে তার পূজারী হয়ে পড়ে এবং দাবী করে তার প্রতীমা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নির্বিশেষে সর্বস্থান সর্বকালে সত্য এবং এটাই বিজ্ঞানের প্রতীমা পূজা। এ প্রকৃতির চিন্তাধারার কার্যফল এই যে, **বিজ্ঞানীরা মনে করেন তারা যে দেব-প্রতীমা উদ্ভাবন করেছেন সেগুলো ছাড়া বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও কার্য পরিচালনা করা স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষে অসম্ভব, এমনকি এ মহাবিশ্ব ধ্বংসের পর আরেকটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে গেলেও এসব দেবপ্রতীমাদের সাহায্য ও পরামর্শ নিতে হবে অর্থাৎ এসব দেবপ্রতীমা যেন বিশ্ব সৃষ্টি ও কার্যপ্রক্রিয়ায় চিরস্থায়ী অংশীদার।** অতীতে এ প্রকৃতির চিন্তাধারা কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রও এ উদ্ভট চিন্তাধারার বাহুল্যতায় জর্জরিত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতিশীলতার জন্য পদার্থিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঠিক মাত্রা নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন হয় হিসাবের বিভিন্ন একক যা ছাড়া বিজ্ঞানের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এসব একক বিজ্ঞানের ভাষায় বিভিন্ন ধ্রুবক নামে পরিচিত এবং এগুলো ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় হিসাবের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এসব ধ্রুবক উদ্ভাবন করা হয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যক্রমের সঠিক বোধগম্যতার জন্য- এসব ধ্রুবকের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। এসব ধ্রুবক যখন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নামে নামকরণ হয় তখন এদের প্রকৃত অর্থ বিকৃত হয়ে যায় এবং এদেরকে বিবেচনা করা হয় স্বগুণে মূল্যবান ও শক্তিময়

সত্তা হিসেবে। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে সবকিছু পরিবর্তন ও গতিশীল এবং সেখানে কোনো প্রকৃত ধ্রুবক থাকতে পারে না। গাণিতিক হিসাবের প্রয়োজনে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ধ্রুবকের প্রয়োজন হলেও প্রাকৃতিক জগতে এসব ধ্রুবক চিরন্তন হতে পারে না এবং বিশ্বজাগতিক দীর্ঘমেয়াদী পরিমাপে ধ্রুবকের মূল্য পরিবর্তিত হতে বাধ্য। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক ধ্রুবকসমূহের কতটুকু পরিবর্তন ঘটে তা এখনো বিবেচনায় আনা হয়নি। বৈজ্ঞানিক ধ্রুবকসমূহের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তরের হার আবিষ্কার করার পূর্ব পর্যন্ত মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা বিভ্রান্তকর। একেকটি ধ্রুবক হলো পদার্থিক সত্তার একেকটি মাত্রা পরিমাপণের জন্য একেকটি একক এবং এ একক কখনো পদার্থের অস্তিত্বের উর্ধ্বে পদার্থ অস্তিত্বময় হবার নিয়ামক হতে পারে না। আর তাকে নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করলে সে হয় একটি প্রতীমা।

বিশ্বসভ্যতার একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক উপাদান হলো ভাস্কর্যের নামে মানবীয় মূর্তি বা প্রতীমা নির্মাণ। বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব, তিনি যে পরিমণ্ডলেরই হোন না কেন, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধার্মিক, তাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের একটি মাত্র নান্দনিক পদ্ধতি এ সভ্যতার জন্য উন্মুক্ত– তা হলো জীবিত কিংবা মৃত, তার প্রতিকৃতি পাথরে খোদাই করে নগরীর প্রধান রাজপথে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক শ্রদ্ধাঞ্জলীর বেদীতে স্থাপন করে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। বিজ্ঞান এ প্রথাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে– তা হলো বিভিন্ন ধ্রুবকগুলোকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নামে নামকরণ। ফলে বিশ্ব বর্ণনার জন্য বৈজ্ঞানিক ভাষা এ রকম : হাবল ধ্রুবকের বদৌলতে বিশ্বের বয়স ১২-১৫ বিলিয়ন বছর এবং প্লাংক ধ্রুবকের বর্ধিত সত্তা প্লাংক সময়ে মহাবিশ্বের আয়তন ছিলো প্লাংক ঘনত্ব, প্লাংক দৈর্ঘ্য ও প্লাংক তাপমাত্রা বিশিষ্ট্য। মহাবিশ্বের সৃষ্টি মুহূর্তে এলান গুথ (Alan Guth) কিছু সময়ের জন্য আইনস্টাইনীয় আলোক ধ্রুবককে সীমালঙ্ঘনের অনুমতি দিলেন যেন অতি স্থিতিশীল বিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে এবং স্টিফেন হকিং আলোর ধ্রুবকের সীমালঙ্ঘনের আগাম অনুমতি দিলেন যেন ভবিষ্যতে কৃষ্ণগহ্বর থেকে হকিং রেডিয়েসন সংঘটিত হতে পারে। কৃষ্ণপদার্থের বিকিরণের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত একটি ধ্রুবক এখন কৃষ্ণপদার্থের বন্দিদশা থেকে স্বাধীন হয়ে সারা বিশ্বের সবকিছু বর্ণনার জন্য এমনকি সৃষ্টি মুহূর্তেও একমাত্র কার্যকর মৌলিক প্রতীমা হিসেবে বৈজ্ঞানিক মহলে পূজা পাচ্ছে।

বিজ্ঞানের প্রতীমা পূজার ফলে একটি জ্ঞাত বিষয় কেমনভাবে অজ্ঞাত হয়ে যায় তার সুন্দর উদাহরণ হলো কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। জে.জে. থমসন আবিষ্কার করেন

ইলেকট্রন এবং তার ভর, আধান, গতি পরিমাপ যোগ্য। কিন্তু নিলস বোরের পরমাণু তত্ত্বে ইলেকট্রনের গতিবেগ কিংবা অবস্থান নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয় এবং এ তত্ত্ব অন্যান্য বিজ্ঞানীদের হাতে আরো বিকশিত হয়ে বর্তমানে বলা হচ্ছে ইলেকট্রন পারমাণুবিক ইলেকট্রনিক মেঘের আড়ালে থেকে কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তন করছে এবং তাকে কোনদিনই সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। এখন এটা শুধু অজ্ঞাতই নয় বরং দুর্জ্ঞেয় এবং সুদূর ভবিষ্যতেও মানবজ্ঞান বৃদ্ধি পেলেও এটা জ্ঞাত হবার কোনো আশা নেই। যে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে ইলেকট্রন সম্বন্ধে মানবজ্ঞান দুর্জ্ঞেয় বলে স্বীকৃত তাকেই আবার সে বিজ্ঞান আরেকটি সমান্তরাল বিশ্বে সমভাবে উপস্থিত বলে দাবী করছে।

বিজ্ঞানের এসব প্রতীমা নির্মাণে প্রকৃত বিজ্ঞানীরা কতটুকু দায়ী আর বিজ্ঞান পূজারীরা কতটুকু দোষী তা বিজ্ঞানের ইতিহাস গবেষকদের গবেষণার বিষয় হলেও তার কিছু চিত্র আমরা ফুটিয়ে তুলব। আধুনিক বিজ্ঞানের বিভ্রান্ত পথ চলার অন্যতম মাইলফলক হলো ইথারের অস্তিত্ব সমন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যর্থতা যাকে বলা হয় এম-এম (মিসেলসন-মরলি) পরীক্ষা।

দার্শনিকভাবে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হলো শূন্যতার অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই স্থানিক কাঠামোর প্রতিটি বিন্দুতে শক্তিময় কোনো সত্তা উপস্থিত যার বৈজ্ঞানিক প্রচলিত পরিভাষা হলো ইথার। তাই ইথারের অস্তিত্বের পরীক্ষাকে বলা যায় দার্শনিক তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। এটার অর্থ হলো পদার্থিক যন্ত্রপাতী অপদার্থিক সত্তার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব পরীক্ষা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা, কিন্তু পদার্থিক যন্ত্রপাতীতে অপদার্থিক সত্তা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না ঘটলে কিংবা প্রতিবিম্বিত না হলে তা যৌক্তিকভাবে পরীক্ষা অসম্ভব। বলা হয় এ পরীক্ষার ফলাফল ব্যর্থ কিংবা ফলাফল বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ। কারণ ইথারকে স্থির কল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু এ পরীক্ষায় স্থির ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ ইথারের বৈশিষ্ট্য কল্পনা করা হয়েছিল স্থির এবং পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো তা স্থির নয় বরং গতিশীল। বিশেষত মিসেলসন আমৃত্যু এটাই বিশ্বাস করতেন কিন্তু আইনস্টাইন ঘোষণা দেন যে, এ পরীক্ষায় ইথারের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণিত হয়েছে এবং শূন্যতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে– যা স্বয়ং মিসেলসন মেনে নিতে পারেননি। ফলে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে আলোর গতির জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন নেই।

বর্তমান বিজ্ঞানের সব গ্রন্থে লেখা হচ্ছে আলো শূন্য মাধ্যমে চলে কিন্তু প্রকৃত সত্য এটা যে শূন্য মাধ্যমে আলোর গতি অসম্ভব। **আইনস্টাইন এটা স্বীকার করলেন একযুগ পরে তার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে (Ether and the theory of**

relativity : A. Einstien)। কিন্তু ন্যায় ও সততার স্বার্থে আইনস্টাইনের উচিত ছিলো স্বীকার করা যে তিনি ভুল করেছেন এবং বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অসত্য। **এরকম বিভ্রান্তি অধিকাংশ লেখক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ধার্মিক, সাহিত্যিক অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছেন**। একটি গ্রন্থ প্রকাশের পর সে গ্রন্থে অসত্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হলেও গ্রন্থটির লেখক তা সংশোধনের প্রয়োজনবোধ করেন না। **পৃথিবীতে খুব কম গ্রন্থকার আছেন যারা নিজ গ্রন্থের সত্যতার প্রতি সন্দেহ থাকায় তা কখনো প্রকাশ করেননি, কারণ তারা অসত্য প্রচারের পাপ থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানে, দর্শনে, গণিতে, সাহিত্যে পাপ শব্দটি বিষয় বহির্ভূত ও হাস্যকর এবং তারা এত নির্বোধ নন যে পাণ্ডিত্য প্রকাশের বরমাল্য হাতছাড়া করে এ জাতীয় শব্দ নিয়ে মাথাব্যথায় নিজ অহংবোধ ভূলুণ্ঠিত করবেন।** বিজ্ঞানে, দর্শনে, গণিতে, সাহিত্যে নতুন একেকটি গ্রন্থ প্রণীত হচ্ছে, মানব জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের পরিবর্তে জ্ঞান তত বিখণ্ডিত হচ্ছে এবং প্রকৃত সত্য আড়াল হয়ে যাচ্ছে। **ফলে একই আইনস্টাইনের হাতে পরস্পর বিরোধী ত্রিমুখী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। একটি হলো বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব, দ্বিতীয়টি হলো সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব, তৃতীয়টি হলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব।**

একটি বৈজ্ঞানিক সত্য কিভাবে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের হাতে মিথ্যে প্রতীয়মান হয়ে পড়ে তার একটি উত্তম উদাহরণ হলো আলোর গতিবেগের ইতিহাস। রোমার (Roemer) বিশ্ব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আলোর গতিবেগ পরিমাপ করেন বৃহস্পতি গ্রহের একটি চন্দ্র গ্রহণের সময়ের সাথে পৃথিবীর আপন অক্ষে পরিভ্রমণের বিভিন্ন দূরত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে। আলোর উৎসের গতি ও পর্যবেক্ষকের গতির সাথে তুলনামূলক তথ্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে রোমার আলোর গতিবেগের পরিমাপ নির্ধারণ করেন। কিন্তু এ ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে বলেন, আলোর গতিবেগ আলোর উৎসের গতির সাথে সম্পর্কিত নয় এবং বর্তমান অনেক বিজ্ঞানী সাক্ষ্য দেন পরীক্ষাগারে আইনস্টাইনের বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইনের বক্তব্য বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে পরিচিত ও জনপ্রিয়। **কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব জনপ্রিয়তা দিয়ে কখনো সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। (Stenley Byers : light speed versus special relativity)**

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হাবল ও হুমাসন যৌথভাবে আবিষ্কার করেন দূর নিহারিকার লোহিত বিচ্যুতি এবং নিহারিকাদের দূরত্বের সাথে লোহিত বিচ্যুতির সম্পর্ক নির্ণয় করে। এ তত্ত্ব মতে কোনো নিহারিকার লোহিত বিচ্যুতি যত বেশী

পৃথিবী থেকে তা ততবেশী দূরে অবস্থিত। কিন্তু বিশ্বের সম্প্রসারণে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের হাতে বিকৃত হয়ে এটার বর্তমান অর্থ হয়েছে কোনো নিহারিকার লোহিত বিচ্যুতি যতবেশী বিশ্ব ততবেশী বেগে সম্প্রসারণশীল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্লাংক আবিষ্কার করেন কৃষ্ণ পদার্থের গবেষণা থেকে আলোর বিকিরণের ন্যূনতম শক্তির একক। এ এককের প্রকৃত মূল্যকে বলা হয় প্লাংক যা তিনি স্বয়ং বুঝতে পারেননি, এটার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছেন প্রথমে আইনস্টাইন পরে নিলস বোর এবং আইনস্টাইন কি বুঝলেন আর নিলস বোর কি বুঝলেন তা দু'জনে নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলল অর্ধ শতাব্দী। পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ বিতর্ক এখনো অব্যাহত আছে। এটার প্রকৃত মূল্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে দ্বন্দ্বের শেষ হয়নি অথচ এটা প্লাংক ধ্রুবক নামে বিবর্তিত হয়ে অনেকগুলো নতুন ধ্রুবকের জন্ম দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের সৃষ্ট একেকটি ধ্রুবকের প্রকৃত মূল্য ও অর্থ বুঝতে না পারার ব্যর্থতার চূড়ান্ত পরিণতি হলো নান্দনিক কাঠামোর ধ্রুবক (Fine structure constant)। এ ধ্রুবককে আর প্রতীমা বলা যায় না, এটা হলো অনেকগুলো ধ্রুবকের সমন্বয়ে প্রতীমাদের মহাবিগ্রহ এবং এটার প্রকৃত অর্থ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। অন্য ধ্রুবকের নির্দিষ্ট কিছু অর্থ ও কর্মক্ষেত্রের সীমা আছে কিন্তু এ মহাবিগ্রহের প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞানীদের কাছে দুর্বোধ্য এবং এটার মূল্য মাত্রাবিহীন (dimensionless) এবং এটাকে দূর প্রাচ্যের সংখ্যাতত্ত্বের গুপ্তবিদ্যাকেও হার মানায়।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত কোয়ান্টাম বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের মন্তব্য হলো : "এটা আবিষ্কারের পর পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে এটার গুপ্তার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চলেছে এবং বিপুল সংখ্যক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীরা এ সংখ্যা (এটার গাণিতিক মান ১৩৭) নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রাচীরে নিজেদের মাথা ঠোকাচ্ছেন..... । এটার প্রকৃত অর্থ কেউ জানে না, এটা পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম গভীর গুপ্তরহস্য, একটি যাদুকরী সংখ্যা যা আমাদের হাতে এসেছে এবং এটা কারো কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। **বলা যায় ঈশ্বর নিজ হাতে এ সংখ্যাকে লিখেছেন কিন্তু আমরা জানি না তিনি পেন্সিলকে কিভাবে চেপে ধরেছিলেন**"।

বিজ্ঞান তার খণ্ডিত সত্যকে দিন দিন আরো খণ্ডিত করে ফেলছে ও ধ্রুবকের সংখ্যা বাড়ছে এবং পরে সেসব খণ্ডিত অংশকে কিছু দূরকল্পনের সাহায্য নিয়ে জোড়া দিয়ে মহা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব পাবার চেষ্টা করছে। ফলে জ্ঞান-মন্দিরে বিভিন্ন ধ্রুবকের নামে প্রতীমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেক সময় একেক প্রতীমা আরেকটির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন এবং একেক প্রতীমার পূজারীরা তাই একে অন্যের প্রতি

সন্দেহপ্রবণ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এত বেশী খণ্ডিত বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছে যে যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শতজন বিজ্ঞানীদেরকে বলা হয় চূড়ান্তভাবে প্রকৃতির কি কি সত্য আবিষ্কার হয়েছে তার একটি স্বতন্ত্র তালিকা প্রণয়ন করতে, তবে দেখা যাবে একেক জনের তালিকা একেক রকম : ২৫% মিল আছে, ২৫% পরস্পর বিরোধী, ২৫% আংশিক ঐক্যমত এবং ২৫% গবেষণাগারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরীক্ষাধীন এবং অদূর ভবিষ্যতে ফলাফল প্রাপ্তির আশা কম।

এটাকে আমরা পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণে নিয়ে একটি নতুন তত্ত্ব তৈরী করতে পারি। **পৃথিবীর তাত্ত্বিক পদার্থ বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ করা যাবে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম তত্ত্ব উভয়েই ৫০% সত্য। এ দু'টোর প্রতিটি থেকে অর্ধেক তত্ত্ব নিয়ে ও তাদের সমন্বয়ে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি (Quantum gravity) তত্ত্বে পরিসংখ্যানিকভাবে সত্যের পরিমাণ মাত্র ২৫%**। এখানে আরো যত নতুন তত্ত্ব যোগ হবে সেখানে সত্যের পরিমাণ কমে আসবে। এজন্য কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি তত্ত্বকে বলা হয় আধুনিকোত্তর বিজ্ঞান (Post modern science) যা পদার্থিক বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব সত্যতার বন্দিদশা থেকে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেছে। **এটাকে বর্ণনা করতে অনেক বিজ্ঞানী পর্যন্ত কুরআনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলছেন চরম সীমালঙ্ঘন (Transgressing the Boundaries)**।

যেহেতু বর্তমান বিজ্ঞান পাপ ও নৈতিকতা মুক্ত তাই তারুণ্যের উন্মাদনায় তার গবেষণা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চমকপ্রদ তত্ত্ব (Heuristic scientific theory) আবিষ্কারের লোভে যেসব বক্তব্য ও যুক্তি উপস্থাপন করেন অপরিহার্যভাবে তা ঐশ্বরিক চৈতন্য বিবর্জিত হয়ে পড়ে।

বস্তুত সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখন সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা বর্জিত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতারণার (Intellectual impostures) সামিল। কিন্তু তারুণ্যোত্তর পরিণত বয়সের ভারাক্রান্ত সময়ে যখন চৈতন্যবোধ ফিরে আসে এবং নিজ বিজ্ঞানের সত্যতার প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ঐশ্বরিক চিন্তায় প্রত্যাবর্তন করতে চান তাদের সেসব বক্তব্য আর বিজ্ঞানের মূল গ্রন্থে স্থান পায় না, সেসব বক্তব্য স্থান পায় বিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রন্থে কিংবা বিজ্ঞানের সাহিত্য গ্রন্থে এবং বিজ্ঞানের মূল বিদ্যানুরাগীদের সেসব গ্রন্থ পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নিজ বিজ্ঞানের প্রতি নিজের অবিশ্বাসকে দ্বিতীয় প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা বলেন বৃদ্ধ বয়সের মানসিক দুর্বলতা ও বুদ্ধিভ্রষ্টতা। ফলে বিজ্ঞানের পাঠকদের জানা থাকে

না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠসব বিজ্ঞানীরা শেষ বয়সে তাদের কর্মজীবন সমন্ধে কতটুকু অটুট বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেন।

ইউরো রেনেসাঁ জাগরণের বিগত শতাব্দীগুলোর বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আস্তিক বিজ্ঞান কিভাবে নাস্তিক বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে এবং বিজ্ঞান কিভাবে মূল্যবোধ শূন্য হয়ে পড়েছে এবং বিজ্ঞান অপবিজ্ঞানের সীমারেখার ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে। ফলে অলৌকিকভাবে যদি নিউটন বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী দেখেন তবে চিৎকার করে বলবেন, "ও মাই গড, আমার নামে কি সব নাস্তিক বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে! আমার প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা তো ঈশ্বর বিবর্জিত ছিলো না, সেটা তো ছিলো ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছার গাণিতিক প্রকাশ"। বর্তমান প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা বলবেন," নিউটন, তোমার গ্রন্থ আমাদের অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই, শুধু তোমার বিজ্ঞানের সূত্র আমাদের প্রয়োজন, তোমার ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই"।

গৌতমবুদ্ধ, যীশুখৃষ্টসহ আরো অনেকে তাদের মূল চিন্তাধারার বিপরীতে তাদের নামে বর্তমানে প্রচলিত চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে এরকম উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করবেন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা হলো তার একটি মূলনীতি যাকে বলা হয় বিভ্রান্তির সম্ভাবনার সূত্র (Theory of falsification), যার অর্থ হলো বৈজ্ঞানিক সত্যতা কখনো প্রকৃত সত্যে পৌছাতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্যে সবসময়ই বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবে এবং এ বিভ্রান্তি হ্রাসকরণই হলো বৈজ্ঞানিক প্রগতি। ফলে বৈজ্ঞানিক সত্যতা সবসময় প্রকৃত সত্যের একধাপ পিছে থাকবে, সত্যে পৌছাতে পারবে না। ফলে প্রাকৃতিক এটম আর বৈজ্ঞানিক এটমের মডেল এক নয়। বৈজ্ঞানিক এটমের মডেল হলো প্রাকৃতিক এটমের বোধগম্যতার জন্য সম্ভাব্য গাণিতিক চিত্রলেখা যা প্রকৃত সত্যের নৈকট্যের দাবী করে মাত্র। **বিজ্ঞান যেদিন প্রকৃত সত্যে পৌছাবে, সেদিন বিজ্ঞানের শেষ- তখন সেটা আর বিজ্ঞান নয়- সেটা তখন কেবল সত্য।**

বাইবেল ও কুরআনে বর্ণিত পৃথিবীর প্রথম মানব আদম হাওয়ার ঘটনা থেকে আমরা জানি শয়তান তাদেরকে প্রলুব্ধ করেছিল নিষিদ্ধ ফল খেতে এবং বলেছিল এটা খেলে তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে। **বর্তমানে শয়তানের কুমন্ত্রণা বিস্তৃত হয়েছে বিজ্ঞানে এবং আধুনিক নিষিদ্ধ ফলের একটির নাম টাইম মেশিন। অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন অদূর ভবিষ্যতে টাইম মেশিন তৈরী সম্ভব।**

এটা তৈরী করতে পারলে অনন্ত জীবন যাপন সম্ভব. কারণ সবসময় সময়ের আগে পিছে ভ্রমণ করতে পারলে মৃত্যুদূত আরোহীদের খুঁজে পাবে না, অন্যদিকে টাইম মেশিনে চড়ে কৃষ্ণগহ্বর ও শ্বেতগহ্বর অতিক্রম করে বিশ্বজগৎ পেরিয়ে স্বর্গোদ্যানে পৌঁছে যাবার সম্ভবনা থাকে।

ভবিষ্যতে টাইম মেশিন তৈরীর সম্ভাবনায় বিশ্বাসী অর্থাৎ আধুনিক শয়তানের নিষিদ্ধ ফল যারা ভক্ষণ করেছেন তাদের মধ্যে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীও আছেন অন্তত ডজন খানেক।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক ভিত্তি ইসলামী তৌহিদ জ্ঞানের পরিপন্থি। ইসলাম মানবীয় সার্বিক জ্ঞানকে বিশ্বজাগতিক চূড়ান্ত ঐক্যের দিকে আহ্বান করে কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিভিন্ন ধ্রুবক সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞানকে আরো খণ্ডিত বিখণ্ডিত করে প্রতীমার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে তৎপর। ফলে বিজ্ঞান যত তথ্য সমৃদ্ধ হচ্ছে তার দেহ কাঠামো থেকে ততবেশী জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। এটা হলো ঐশী-জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের তথ্য প্রবাহের সম্পর্ক।

(William C. Chittik : Modern science and the eclipse of Tawhid)

প্লাটোর গুহামানবেরা অনেক সাধনায় গহীন পার্বত্য এলাকা থেকে সমতলে এসে পৌঁছেছে এবং ছায়ার বদলে সরাসরি প্রকৃতির বাস্তব প্রকৃতি দেখার চেষ্টা করছে এবং অন্ধদের হাতি দেখার আকাঙ্ক্ষীরা শৈল চিকিৎসকের সহযোগিতায় দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছে কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি এখনো ক্ষীণ। হাতির চারপাশে যে যার অবস্থানে দাঁড়িয়ে সামনে যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে তা অস্পষ্ট ও ঘোলাটে এবং এরকম অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি থেকে হাতির পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতির জ্ঞান সম্ভব কিনা তা নিয়ে একে অপরের সাথে বিতর্ক করছে। কেউ বলছে হাতিকে দেখতে হলে নিউটনীয় বিজ্ঞানী হতে হবে, কেউ বলছে আপেক্ষিক বিজ্ঞানী, কোয়ান্টাম বিজ্ঞানী কিংবা বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী, কেউ বলছে দার্শনিক, গণিতবিদ কিংবা ধার্মিক। যে যার অবস্থানের সাপেক্ষে দাঁড়িয়ে নিজ দৃশ্য মানবতাকে অন্যকে বিচারের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করছে এবং হাতির পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি বোধগম্য না হবার দোষ একে অপরের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কেউ বলছে এজন্য দায়ী বিজ্ঞান, কেউ বলছে দর্শন, কেউ বলছে গণিত। হাজার বছরের তপস্যায় মানুষের জ্ঞান অন্বেষণে চৈতন্যবোধ হয়েছে মাত্র এটুকু।

প্রকৃতির যেসব প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশায় দর্শনের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং কিছুটা উত্তর খুঁজে পেয়েছিল দর্শন বয়োবৃদ্ধ হওয়ায় বিজ্ঞান সে দায়িত্ব নিয়ে সে

উত্তরগুলোকেও হারাতে বসেছে। কারণ দর্শন ছিলো জ্ঞানের প্রতি পরম আগ্রহী ব্যক্তির প্রচেষ্টা কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অচল এবং সেটার বিপুল অর্থ যোগান দেয় রাষ্ট্র কিংবা ব্যবসায়ী সংগঠন। **ফলে আধুনিক বিজ্ঞান রাজনীতি ও অর্থনীতির মুখাপেক্ষী এবং তাদের স্বার্থান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত। রাজনীতি ও অর্থনীতি আবার প্রকৃত অর্থে ধর্মবিহীন ও ঈশ্বরবিহীন।** তাই এটা হলো স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টি ব্যাখ্যার বিশ্বাসবিহীন প্রজন্মের বৈজ্ঞানিক ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফসল যা বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে দণ্ডায়মান অন্তঃসারশূন্য তত্ত্ব ভারাক্রান্ত মহীরুহ যা হাওয়ায় উড়ে যায় এবং বিজ্ঞানীরা পরাজয়ের গ্লানী নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে হতাশায় কেবল তাকিয়ে দেখেন। এ যন্ত্রণার প্রসববেদনায় যেটুকু কারিগরী উৎকর্ষতা সাধিত হয় বিশ্ব মানব কল্যাণের পরিবর্তে তা কেবল জাতীয়তাবাদী কোনো রাষ্ট্রের বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি স্বার্থের পূজাবেদীতে প্রতীমা বিসর্জন হিসেবে কার্যকর মাত্র।

আল্লাহর আরশ এবং সিদরাতুল মুনতাহা

পবিত্র কুরআনুল কারীমে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, সংরক্ষক ও সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাধিকারী আল্লাহ তায়ালা নিজের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন যার আবরী শব্দ হলো আরশ, বাংলায় সম্ভাব্য অর্থ রাজ-সিংহাসন, ইংরেজীতে Throne। যদিও তিনি বিশ্বজগতের সবকিছু দেখেন, সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন এবং সবকিছুর উপর তার ক্ষমতা ও নির্দেশ কার্যকর তবু তিনি মহাবিশ্বের কোথাও অবস্থান করেন না। তিনি অবস্থান করেন আরশে এবং সমস্ত বিশ্বজগতকে বর্ণনা করেছেন তার কুরসী হিসেবে, বাংলায় সম্ভাব্য অর্থ হলো উচ্চ সিংহাসনের তলে পা রাখার জন্য নিচু ও ছোট পিঁড়ি বিশেষ, ইংরেজীতে foot-stool। অর্থাৎ সাত আসমান জমীন তথা বিশ্বজগৎ হলো আল্লাহ তায়ালার পা রাখার স্থানের সদৃশ এবং বর্তমানে তার আরশ হলো বিশ্বজগতের সীমা শেষে সিদরাতুল মুনতাহার পর। **আমরা জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি শিরোনামে সনাক্ত করেছি সিদরাতুল মুনতাহা হলো বিশ্বজাগতিক স্থান ও কালের শেষ সীমা এবং তার পর স্থান ও কাল নেই, তাই সেখানে গতি অসম্ভব এবং তা অতিক্রম করা অসম্ভব।**

সৃষ্টিকর্তার অবস্থান এ বিশ্বজগতের ঊর্ধ্বে তা নিয়ে বিশ্বের সবদেশের সর্বকালের ঈশ্বরে বিশ্বাসী অধিকাংশ দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও ধার্মিকগণ কমবেশী একমত এবং এ নিয়ে খুব বেশী বিতর্ক নেই। কিন্তু ধার্মিক কিংবা অধার্মিক জ্ঞানীগুণী জনের চিন্তাধারা ও যৌক্তিক প্রণালী ও বোধগম্যতা কুরআনের একটি আয়াতের বক্তব্যে হোচট খেয়ে থেমে গেছে এবং বিগত হাজার বছরেও এটার সম্ভাব্য অর্থগ্রহণে মানুষের সার্বিক জ্ঞান তেমন অগ্রসর হয়নি। ফলে অধার্মিক জ্ঞানী গুণীজন কুরআনের এ বক্তব্যকে বুঝতে না পেরে প্রচণ্ডভারে আক্রমণ করেছেন এবং মুসলিম জ্ঞানী গুণীজন তার উত্তর দিতে না পেরে পরম ধৈর্যের সাথে এসব আক্রমণ সহ্য করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিলো না।

আমরা এখন সেসব আক্রমণের উত্তর দেব। এজন্য কুরআনের সে আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে তা বিশ্লেষণ করব-

"তিনি সমস্ত আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে এবং সে সময় তার আরশ ছিলো পানির উপরে যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী---।" (সূরা হূদ : আয়াত-৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আসমান জমীন তথা সমগ্র বিশ্বজগৎ ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সে সৃষ্টি মূহুর্তে তার আরস ছিলো পানির উপরে এবং যৌক্তিকভাবে মানুষের কাছে বিষয়টি বোধগম্য না হলেও এটার উপর বিশ্বাস অবিশ্বাস হলো মানুষের জন্য তার ঈমানের একটি পরীক্ষা। বিগত হাজার বছরে এটা মানুষের কাছে বোধগম্য না হলেও মুসলিমগণ এটাকে বিশ্বাস করে ঈমানের পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন এবং বিধর্মীদের আক্রমণ সহ্য করেছেন। এখন আমরা কুরআনিক বক্তব্যের পরম সত্যতা ও যৌক্তিকতার বিষয়ে আলোকপাত করব।

ছয়দিনে বিশ্বসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অধার্মিক জ্ঞানী গুণীজন বর্তমান প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের প্রেক্ষাপটে অযৌক্তিক বিবেচনা করে প্রত্যাখান করেছেন কারণ বিজ্ঞানীদের হিসাবে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য বয়স কমবেশী ১৩ বিলিয়ন বছর যা ছয়দিনের ধারণাকে বিলিয়নে প্রলম্বিত করলেও সংগতিপূর্ণ হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাথে বিশ্বের বয়স সম্পৃক্ত করে বিষয়টি অর্থহীন করে তুলেছেন কারণ এ দু'টো বিষয় মূলত এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে একটি মানবশিশুর জন্মবৃত্তান্তকে উল্লেখ করা যেতে পারে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সম্মিলনে সৃষ্ট অতিক্ষুদ্র মানবভ্রূণ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যদিয়ে কমবেশী নয় মাস অবস্থানের পর পূর্ণাঙ্গ মানব অবয়বে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় এবং জন্মলাভের পর থেকে তার দৈহিক মানসিক ও চৈতন্যের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং তার বয়স গণনা শুরু হয়। জন্মপূর্ব মাতৃগর্ভে অবস্থান কালিন অবস্থা আর জন্মলাভের পর তার দৈহিক গঠন ও আকার বিকাশের প্রবৃদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় এবং এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। একইভাবে বিশ্ব সৃষ্টির শুরুর প্রক্রিয়ায় বিশ্বের প্রাথমিক আকার লাভ এবং তা বিভিন্ন ধাপে ধাপে বিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ সম্পূর্ণ আলাদা। তাই ছয়দিনে বিশ্বসৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সাথে বিশ্বের বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই এবং বিভ্রান্ত হবার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আমরা "ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি ও বিজ্ঞানীদের উভয় সংকট" অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ইমাম গাযযালীর ভাষায় বিশ্বের বয়স ও আকার কত কিংবা কম না বেশী, তার সাথে বিশ্ব সৃষ্ট কি সৃষ্ট নয়, এ দু'টোর মধ্যে যৌক্তিক কোনো সম্পর্ক নেই। তার ভাষায়- যদি বলা হয় পিয়াজের পার্থিবতা ততক্ষণ পর্যন্ত জানা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত জানা না যাবে পিয়াজে কতটি খোসা আছে কিংবা ডালিমে কতগুলো বিচি আছে। কিংবা যদি বলা হয় একটি গৃহ কোনো ইচ্ছাময় সত্তা কর্তৃক নির্মিত কিনা সেটা জানতে হলে আগে জানতে হবে গৃহটি কয়টি কোণা বিশিষ্ট ও কতটি কাঠ

আছে- এ ধরনের যুক্তি বুদ্ধিমান কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বর্তমান বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করে কেবলমাত্র পেয়াজের খোসা খুলে গণনা করছে যে প্রকৃতির রহস্যের কয়টি স্তর ভেদ করা সম্ভব কিন্তু বিশ্ব সৃষ্ট কি সৃষ্ট নয় সে প্রশ্নের উত্তর তার গবেষণার ক্ষেত্রের বহির্ভূত রয়ে গেছে।

কুরআনের আলোচ্য আয়াতের আক্ষরিক অর্থ হলো মহাবিশ্ব সৃষ্টি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার আরশ ছিলো পানির উপর আরবী মূল শব্দ 'ময়া' এবং ইংরেজীতে শব্দার্থ হলো Water। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্য হলো পানির উদ্ভব ঘটেছে বিশ্ব সৃষ্টির অনেক পরে। বিশ্ব সৃষ্টির সময়ে পানির অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়, তাই এটা হলো একটি উপমিত শব্দ এবং এটার মূল অর্থ হবে অবশ্যই ভিন্ন। তাই আমরা এ ক্ষেত্রে পানির বৈশিষ্ট্যগত অর্থকে গ্রহণ করব। পানির বৈশিষ্ট্য হলো তরল পদার্থিক বা তারল্যতা liquidy, fluidity। অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির সময়ে আল্লাহ তায়ালার আরশ ছিলো তরল জাতীয় অতি প্রাকৃতিক সত্তার উপর এবং বিশ্ব সৃষ্টির আদি উপকরণ হলো এই তরল জাতীয় অতি প্রাকৃতিক সত্তা। এটাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বিশ্বের মৌলিক উপকরণ হিসেবে। আল্লাহ তায়ালা যেমন জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে তেমনি সমস্ত পদার্থিক জগৎ সৃষ্টি করেছেন অতি প্রাকৃতিক তরল জাতীয় আদি সত্তা থেকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্য এক আয়াতে এ তরল অতি প্রাকৃতিক পদার্থের বর্ণনায় আরেক উপমিত শব্দ ব্যবহার করেছেন জয়তুন ফলের তৈলের সাথে। এটা বোধগম্য হবার জন্য আমাদেরকে আবার বিশ্ব সৃষ্টি প্রসঙ্গে হাজার বছরের দার্শনিক জ্ঞানের কিছু ধারণা ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ বিশ্বের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে এটম বা পরমাণু ধারণা প্রচলন করেন এবং তাদের মতে এসব পরমাণু মহাশূন্যে (Viod) গতিশীল থেকে বিভিন্ন আকারের পদার্থের সৃষ্টি করে। কিন্তু অ্যারিস্টটল শূন্যের ধারণার বিরোধিতা করেন। শূন্যস্থানের অস্তিত্বের অসম্ভবতা প্রমাণ করেন মুসলিম দার্শনিক আল-কিন্দি। তার গ্রন্থে 'ফি আল ফালসাফাত আল আউলা' (On first philosophy) তিনি ব্যাখ্যা করেন শূন্যের অর্থ হলো এমন একটি অবস্থা বা জায়গা যেখানে কোনো কিছু স্থাপন করা হয়নি। কোনো স্থান এবং সেখানে কোনো কিছু স্থাপন পরস্পর সম্পর্কিত এবং একটি অপরটির পরিপূরক এবং একটি অপরটির পূর্ববর্তী হতে পারে না। তাই যদি কোনো স্থান থাকে সেখানে অবশ্যই কোনো কিছু স্থাপিত থাকবে এবং যদি কোনো কিছু স্থাপন করা হয় তবে তার জন্য অবশ্যই স্থান থাকবে। ফলে কোনো কিছু স্থাপন ব্যতিত কোনো স্থান হতে পারে না। কিন্তু শূন্যের অর্থ হলো এমন একটি স্থান যেখানে কোনো কিছু স্থাপন করা হয়নি। তাই

আল-কিন্দির সিদ্ধান্ত হলো শূন্যতার অস্তিত্ব অসম্ভব। আল-কিন্দি আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন স্থানে যা কিছু স্থাপন করা হয় তা হলো পদার্থিক সত্তা এবং পদার্থ, গতি ও সময় হলো যুগপৎ (Simultaneous) ঘটনা, একটি থেকে অপরটি পৃথক নয়। তার মতে পদার্থ, গতি ও সময় হলো পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য (Quantitative) এবং তাই এরা অসীম হতে পারে না।

স্থানে যা কিছু স্থাপিত থাকে পশ্চিমা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে পরবর্তীতে তা পরিচিত হয় ইথার নামে এবং আমরা এ শব্দকে প্রতিস্থাপনের পক্ষপাতি হলেও বর্ণনার সুবিধার্থে আপাততঃ এ শব্দকেই ব্যবহার করব। ফলে স্থান ও ইথার (Space and ether) হলো একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু ইথারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে তেমন কোনো ঐক্যমত নেই। বিশেষত ইথার কি কণাধর্মী নাকি তরঙ্গধর্মী, গ্যাসীয়, বায়বীয়, তরল না কঠিন, শক্তিময় নাকি শক্তিবিহীন, স্থির নাকি গতিশীল তা নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। অনেকে আবার স্থান ও ইথারকে পৃথক বিবেচনা করে স্থানকে স্বীকার করেছেন, ইথারকে প্রথমে অস্বীকার, দ্বিতীয়বার স্বীকার এবং তৃতীয়বার দ্বিধাদ্বন্দ্বে সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগেছেন।

শূন্যস্থানের অস্তিত্বের অসম্ভবতা হলো একটি ধর্মীয় ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং এটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রসীমার পূর্ববর্তী। স্থানে যা কিছু স্থাপিত হয় তাকে ইথার কিংবা যে নামেই ডাকা হোক না কেন তা কণাধর্মী বৈশিষ্ট্যের হতে পারে না, কারণ কণারূপী সত্তায় (Discrete) একাধিক কণার মাঝে ফাঁক থাকে এবং সেটা শূন্যস্থানের প্রতীক এবং আমরা দেখেছি শূন্যস্থানের অস্তিত্ব অসম্ভব। এটা তরঙ্গধর্মীও হতে পারে না কারণ তরঙ্গের যে সব চিত্র অংকন করা হয় তাতে দেখা যায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বরাবর ফাঁক আছে। ইথারের বৈশিষ্ট্য এমন হতে হবে যে স্থানের কোনো বিন্দুতে সামান্যতম ফাঁক বা শূন্যতা থাকতে পারে না এবং তাই এটা হলো বিরামহীনতা (Continum)। এ বৈশিষ্ট্য কেবল চিরায়িত ধারণার তরল ও কঠিন পদার্থের হতে পারে কিংবা নমনীয় স্থিতিস্থাপক রাবার জাতীয় পদার্থের (Elastic)। কিন্তু স্থানের বৈশিষ্ট্য কঠিন জাতীয় পদার্থের ন্যায় হলে তার অভ্যন্তরে পদার্থের গতিশীলতা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এজন্য আধুনিক পরিভাষায় ইথারকে সঠিক অর্থে ব্যবহার করতে বলা হয় লিকুইড ইথার (Liquid ether), ফ্লুইড ইথার (Fluid ether) ডাইনামিক ইথার (Dynamic ether), ইলাষ্টিক ইথার (Elastic ether) কিংবা গতিময় ইথার। তরল পদার্থের আরেক বৈশিষ্ট্য হলো এটা অসংকোচনযোগ্য (Incompressible) অর্থাৎ কোনো চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে

এটাকে সংকোচন করা সম্ভব নয়। কারণ চাপের মাধ্যমে ইথার সংকুচিত হলে শূন্যতার অস্তিত্বের সম্ভাবনা হয় যা অসম্ভব। পদার্থিক কোনো চাপ ইথারকে সংকুচিত করতে পারে না এবং তাই আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের বিপুল ভর সম্পন্ন নক্ষত্রের উপস্থিতিতে স্থানের বক্রতা অসম্ভব। ইথারের চাপে পদার্থ সংকুচিত হতে পারে কিন্তু পদার্থের চাপে ইথার সংকুচিত হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু ইথারকে সংকুচিত করা সম্ভব নয়, তাই ইথার পদার্থিক সত্তার চেয়ে বেশী শক্তিময় ও গতিশীল। ইথার এমন শক্তিময় ও গতিশীল যে তা যে কোনো পদার্থ তা সে পৃথিবী, সূর্য বা নক্ষত্র বা যে কোনো কঠিন ও ঘন বস্তুই হোক না কেন তা সে ভেদ করতে পারে। কারণ যদি সে কঠিন পদার্থ ভেদ করতে না পারে তবে তার অর্থ হলো কঠিন পদার্থের অভ্যন্তর স্থান শূন্য যা অসম্ভব।

স্থান যে প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন তার যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি এখন বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সাধারণ তরল পদার্থের সাথে তরল ইথারের পার্থক্য হলো তরল পদার্থে কোনো কঠিন পদার্থ স্থাপন করলে তা তরল পদার্থকে প্রতিস্থাপন করে কিন্তু তরল ইথারে কোনো কঠিন পদার্থ স্থাপিত হলে তা ইথারকে প্রতিস্থাপন করে না বরং পদার্থের প্রতিটি বিন্দুতে অনুপ্রবেশ করে। প্রতিটি জৈবপদার্থে বা জীবকোষের প্রতিটি বিন্দুতে যেমন তরল জৈবরসের অনুপ্রবেশ আছে কিংবা স্বচ্ছ কাঁচের পিণ্ডের মধ্যে আলো যেভাবে ভেদ করে যায় পদার্থের সাথে স্থানের সম্পর্ক সেরকম। তাই ইথারসহ স্থানের কাঠামো হলো এমন একটি ক্ষেত্র যা পদার্থকে কেবল ধারণই করে না বরং এটা হলো পদার্থ উৎপত্তির গর্ভস্থল। তাই স্থান বা স্থানে স্থাপিত ইথারের সঠিক বর্ণনার জন্য উপযুক্ত ভাষাই হলো তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সত্তা।

পদার্থ সৃষ্টির পূর্বশর্ত হলো পদার্থ ধারণের জন্য স্থান– যা আবার অবশ্যই হবে শক্তিময়, কারণ সেটা শক্তিময় না হলে পদার্থ স্থিতিশীল হবে না। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা স্থানের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে সরাসরি পদার্থ অস্তিত্ব লাভের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন, যেমন বিগ ব্যাংগ বিশ্বতত্ত্ব। এখানে **একটি অসীম ঘনত্ব বিশিষ্ট একটি অনন্য বিন্দুর সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সে অনন্য বিন্দুর (singularity) চারপাশে স্থান না থাকলে তার অস্তিত্বও সম্ভব নয়, সম্প্রসারণও সম্ভব নয়।** বিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো বিশ্ব সৃষ্টির বিষয়কে আলোর গতির সাথে সম্পর্কিত বলে কল্পনা করা, কিন্তু এটা বস্তুত ইথারের বা স্থানে অবস্থিত শক্তির গতির সাথে সম্পর্কিত কারণ সেটার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আলোর প্রবাহ বা গতি অসম্ভব। আর ইথারের গতি আলোর গতির

চেয়ে কমপক্ষে বিলিয়ন গুণ বেশী অনেক বিজ্ঞানী তা বিশ্বাস করেন।

কুরআনিক বর্ণনায় সৃষ্টি মুহূর্তে না ছিলো স্থান, না ছিলো কাল, ছিলো শুধু তরল জাতীয় অতি প্রাকৃতিক সত্তা। এটা হলো অতি ঘন, অতি শীতল, অতি পরিবাহিতা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (Super cool, Super conductivity)। ফলে সেখানে কোনো তাপও ছিলো না। এমতাবস্থায় সেখানে দৃশ্যময় আলোও নেই। বিশ্ব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তায়ালা আদি সত্তা (Primordial entity) হিসেবে এ অতি প্রাকৃতিক তরল সত্তা সৃষ্টি করেন। আধুনিক ভাষায় এটাকে বলা যায় অতি শীতল তরল পদার্থিক বৈশিষ্ট্যের আদি সত্তা। পদার্থ বিজ্ঞানের সবগুলো ধ্রুবকের মূল্য এখানে শূন্য। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বিশ্লেষণে আমরা যতদূর ধারণা করতে পারি তা হলো এ অতি প্রাকৃতিক তরল সত্তা চৌম্বকীয় শক্তি বিশিষ্ট এবং এ কারণেই ইথার, ফোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রোটন সবই চৌম্বকীয় শক্তি সম্পন্ন এবং এটাই হলো পার্থিব বিশ্বের সমস্ত শক্তির মূল।

বর্তমান বিশ্বের ইথারিক শক্তিকে বিভাস দে নাম দিয়েছেন উৎসবিহীন স্থির চৌম্বকীয় শক্তি (Source free magnetostatics force)। বিশ্ব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তায়ালা জয়তুন বৃক্ষের তৈল সদৃশ সত্তাকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঐ অতি ঘন তরল পদার্থিক সত্তাকে তরলায়িত করেন এবং তা ঐ প্রদীপ থেকে বিচ্ছুরিত নূর দ্বারা পূর্ণ করেন। ফলে এটা হলো শক্তিময় ও গতিময় ইথারে পূর্ণ স্থান বা আল্লাহর জ্যোতিপূর্ণ ক্ষেত্র এবং পদার্থিক বিশ্ব সৃষ্টির আদি ও মৌলিক উপাদান। এটা হলো বৈজ্ঞানিক সত্য অন্বেষণের সবকিছুর তত্ত্ব (Theory of everything) বা মহা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব (Grand unified theory)। এটা মাত্রাবিহীন (Dimentionless) সত্তা, তাই এটার আকার, ভর ও অন্যান্য মাত্রা অর্থহীন। এটা আল্লাহর জ্যোতি প্রাপ্তির ফলে তাৎক্ষণিক গতিবেগে চারদিকে বিস্তৃত ও গতি প্রাপ্ত হয় এবং পরে ধীরে ধীরে সেখান থেকে ইথারের চেয়ে নিম্ন গতিবেগ সম্পন্ন উচ্চশক্তির আলোর মেরুকরণ সংঘটিত হয়। সে আলোর গতিবেগ আরো কমে এসে গামা রশ্মি থেকে ইলেকট্রন পজিট্রন এবং তা থেকে নিউট্রন প্রোটন সৃষ্টি হয়ে হাইড্রোজেন হিলিয়াম ইত্যাদি পদার্থ সৃষ্টি হয় যা আমরা "জ্যোতি, ফোটন, ইলেকট্রন-প্রোটন" অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ইথারের গতিবেগ থেকে অব্যাহতভাবে ফোটন, ইলেকট্রন প্রোটন গতিশক্তি লাভ করে এবং এটা হলো ভারী পদার্থের গতি জড়তার শক্তির উৎস এবং পদার্থের মধ্যে চারপাশ থেকে এটার চাপ হলো মহাকর্ষ বল এবং অত্যাধিক ভারী পদার্থ অর্থাৎ সূর্য বা নক্ষত্রের গায়ে মহাকর্ষ বলের চাপে যে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি বিচ্ছুরিত হয় তা হলো দৃশ্য অদৃশ্য আলো।

অর্থাৎ স্থান হলো এমন এক শক্তি বিশিষ্ট ও গতিময় ক্ষেত্র যা পদার্থ উৎপাদন করে ও পদার্থকে ধারণ করে এবং যেখানে পদার্থ উৎপত্তির সাথে সাথে সে গতিশক্তি লাভ করে।

বিজ্ঞানীদের বর্ণিত বিগ ব্যাংগ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাথে আমাদের বর্ণনার মূল পার্থক্য হলো বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব হলো উষ্ণ প্রক্রিয়া (Super hot fusion) আর আমাদের বর্ণনা হলো শীতল প্রক্রিয়া (Super cold fusion)। বস্তুত পদার্থের অস্তিত্বহীনতায় তাপের অস্তিত্ব অর্থহীন। বিজ্ঞানীদের বর্ণনা হলো স্থানবিহীন অতি ঘন অতি উষ্ণ আদি পদার্থের বিস্ফোরণ, আর আমাদের বর্ণনা হলো অতি প্রাকৃতিক তরল জাতীয় সত্তার গতিশীলতা প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রথমে স্থানের উৎপত্তি এবং সেই স্থানের শক্তি থেকে উচ্চ শক্তির আলো বা ফোটন এবং তার গতি হ্রাসের মধ্যদিয়ে থেকে নিম্নশক্তি সম্পন্ন আলো এবং তা স্থূলকরণের মধ্যদিয়ে আলোর থেকে কম গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন প্রোটনের অস্তিত্ব লাভের মধ্য দিয়ে পদার্থ সৃষ্টি। বিজ্ঞানীদের বর্ণনা হলো একটি অনন্য বিন্দু থেকে পদার্থ চারদিকে বিক্ষিপ্ত বেগে সম্প্রসারণ এবং আমাদের বর্ণনা হলো তরল সত্তার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন নিখিল বিশ্ব ধারণের জন্য স্থানের সৃষ্টি এবং স্থানিক কাঠামো থেকে আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন স্থানে একসাথে পদার্থিক পিণ্ড তথা গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা সৃষ্টি। বিজ্ঞানীদের বর্ণনায় বিশ্বের সমস্ত পদার্থ আদি মুহূর্তে একসাথে একই বিন্দুতে সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু আমাদের মতে বিশ্বের সব পদার্থ একসাথে আদি মুহূর্তে সৃষ্টি হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এটা যে কোনো স্থানে যে কোনো মুহূর্তে এমনকি এখনো সম্ভব, কেবল স্থান সৃষ্টি হয়েছিল একসাথে এবং সেটাই হলো বিশ্বের প্রারম্ভিকতা।

প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হলো শূন্য আয়তনের অসীম সম্প্রসারণ অথচ তাত্ত্বিকভাবে শূন্য ও অসীম দু'টোই বুদ্ধির অগম্য। বিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে সময় দ্বারা বর্ণনা করা যায় না কারণ তখন সময়ের বর্তমানে প্রচলিত মূল্য অর্থহীন। ইমাম গাযযালীর ভাষায়- আগে আল্লাহ তায়ালা ছিলেন কিন্তু বিশ্ব ছিলো না এবং পরে আল্লাহ আছেন ও সাথে সাথে বিশ্বও আছে অর্থাৎ আল্লাহ হলো বিশ্বের পূর্ববর্তী।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বের জন্য চারটি মৌলিক শক্তি সনাক্ত করেছেন :

মহাকর্ষ বল, বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বল, দুর্বল পারমাণবিক বল ও শক্তিশালী পারমাণবিক বল। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানীদের এ হিসেবে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি দেখতে পাচ্ছি। পদার্থের গতি জড়তা যার ফলে গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকাসহ ছোট বড় সমস্ত পদার্থ প্রচণ্ডবেগে গতিশীল। কোন্ যুক্তি বলে বিজ্ঞানীরা এত বিপুল শক্তির উৎসকে

একটি মৌলিক শক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলেন না, তা আমাদের বোধগম্য হলো না এবং বিজ্ঞানের সব গ্রন্থ এ বিষয়ে নির্বাক। এত বিপুল পরিমাণ শক্তি কিভাবে বিজ্ঞানের হিসাব থেকে বাদ পড়ে গেল এবং বিজ্ঞানীরা এ শক্তির উৎস প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন কিংবা তাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেল সে এক বিরাট রহস্য। এ রকম হিসাবের গড়মিল দিয়ে বিজ্ঞানীদের সব মৌলিক শক্তির সমন্বয়ে মহাঐক্যবদ্ধ শক্তির উৎস খুঁজে পাবার স্বপ্ন ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং তাদের এ ব্যর্থতায় তারা নিজেরাই ক্রন্দন করে ফিরছেন। আমাদের প্রস্তাব হলো পদার্থের গতিশক্তিকেও মৌলিক শক্তি হিসেবে বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হোক।

ইতোমধ্যেই আমরা সনাক্ত করেছি বিজ্ঞানীরা যাকে মহাঐক্যবদ্ধ শক্তি (Grand unified force) বলছেন কিন্তু তার উৎস খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হলো বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইথারে পূর্ণ স্থান, ধর্মীয় ভাষায় আল্লাহর জ্যোতিপূর্ণ ক্ষেত্র এবং এটার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হলো মহাকর্ষ বল, বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বল ও গতি জড়তা যা আমরা 'বিশ্বপ্রতিপালক' নামক অধ্যায়ে সূর্যের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছি। বাকী দু'টি বল অর্থাৎ দুর্বল ও শক্তিশালী পারমাণবিক বল সমন্ধে গভীর অধ্যয়ন করতে গেলেই বলা হয় কোয়ান্টাম ইলেকট্রো-ডিনামিক (QED) ও কোয়ান্টাম ক্রোমো-ডিনামিক (QCD) ছাড়া এটি বোধগম্য হবে না। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পুরোটাই নিলস বোরের বিভ্রান্ত পরমাণু তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা শূন্যস্থানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে, যা আবার প্লাংক ধ্রুবকের প্রকৃতমাত্রা অনুধাবনের ব্যর্থতার ফসল।

আপেক্ষিক তত্ত্বও শূন্যস্থানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে যা অসম্ভব। বিগত একশত বছরে এ বিভ্রান্তি মানবজ্ঞানকে চরমভাবে কলুষিত করেছে এবং জ্ঞানের এ অপবিত্রকরণ প্রক্রিয়া (Desecration of knowledge) থেকে যতদিন বিজ্ঞানীরা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন না করেন ততদিন পর্যন্ত সেখান থেকে কোনো তথ্য গ্রহণ করা থেকে আমরা বিরত থাকব। তবে তিনটি মৌলিক শক্তিকে আমরা একই উৎস থেকে নির্গত বলে চিহ্নিত করেছি এবং বাকী দু'টিও একই উৎস থেকে নির্গত বলে গ্রহণ করার যুক্তি সঙ্গত বিশ্বাস আমাদের আছে। কারণ আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি স্থান শক্তিশূন্য হলে সেখানে অণু পরমাণুর দুর্বল ও শক্তিশালী বল কোনোটাই কার্যকর ও অস্তিত্বময় থাকে না, ফলে অণু পরমাণুর অস্তিত্বশীল থাকা সম্ভব নয়।

স্থানিক কাঠামোর শক্তি ও গতিশীলতার পরিমাণ বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি তবে এটার গতিবেগের পরিমাণ মহাকর্ষ বলের গতি থেকে ধারণা

করা যায়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন মহাকর্ষের গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে অন্তত বিলিয়ন গুণ বেশী। যেহেতু স্থানের কোনো বিন্দু কোনো পদার্থিক শক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না তাই ধারণা করা হয় স্থানিক কাঠামোর শক্তি গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা যে কোনো পদার্থিক শক্তির চেয়ে বেশী। কারণ স্থানিক কাঠামোর শক্তি যে কোনো কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরের প্রতিটি বিন্দু ভেদ করে যেতে পারে। তাই সূর্যের সমস্ত শক্তি একটি বিন্দুতে জড় হলেও তা স্থানের কোনো বিন্দুকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। আর তাত্ত্বিকভাবে কোনো বিন্দুতে পদার্থের অপরিসীম ঘনত্ব অসম্ভব কারণ তাহলে পদার্থ স্থানের কোনো বিন্দুকে প্রতিস্থাপন করে এবং শূন্য আয়তনে অসীম ঘনত্ব অরোপ করা হয় যা অযৌক্তিক। তাই বিজ্ঞানীদের কৃষ্ণগহ্বর হলো একটি কল্পনার বিষয় আর সে কল্পিত কৃষ্ণগহ্বর থেকে হকিং রেডিয়েশন হলো দ্বিগুণ কল্পনা।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ বিশ্বের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং অ্যারিস্টটলও বিশ্বের চিরন্তনতার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন। কিন্তু আল-কিন্দি, ইমাম গায্যালীসহ অধিকাংশ মুতাকাল্লিমগণ চিরন্তন বিশ্বের (Iternity of the world) বিরোধিতা করেন এবং এজন্য দার্শনিক ও গাণিতিক যুক্তি উপস্থাপন করেন। এসব যৌক্তিক প্রণালীর সহজবোধ্য একটি ধারা এরকম- ইমাম গায্যালী জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করে বলেন- আমাদের ১২ বছরের সমান হলো বৃহস্পতি গ্রহের এক বছর, আমাদের ৩০ বছরের সমান হলো শনি গ্রহের এক বছর এবং একইভাবে ৩৬,০০০ বছরের সমান হলো এক নাক্ষত্রিক বছর (একইভাবে সূর্য ২৫ মিলিয়ন বছরে একবার আমাদের গ্যালাক্সী পরিভ্রমণ করে)। তাই বিশ্বসৃষ্টির পর পৃথিবী যতবার পরিভ্রমণ করেছে, বৃহস্পতি পরিভ্রমণ করেছে তা ১/১২ বার, শনি ১/৩০ বার, ধ্রুব নক্ষত্র ১/৩৬০০০ বার কিংবা সূর্য পরিভ্রমণ করেছে ১/২৫,০০০,০০০ বার এবং বৃহস্পতি, শনি, ধ্রুব নক্ষত্রের কিংবা সূর্যের পরিভ্রমণ সংখ্যা সমান হতে পারে না। বিশ্ব চিরন্তন হলে সবাই সমান সংখ্যক বার পরিভ্রমণ করেছে যা যৌক্তিক ও গাণিতিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাহাফুত আল-ফালসিফাত-Incoherence of the philosophers)

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে আপেক্ষিক তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির মোহের ফাঁদে বিগ ব্যাংগ বিশ্বতত্ত্ব জনপ্রিয় হতে থাকে, যেখানে বলা হয়– একটি চরম অনন্যতার বিন্দু থেকে উষ্ণ বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ উৎপত্তি লাভ করে যা কম বেশী বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও এ তত্ত্বে বিশ্বের একটি প্রারম্ভিকতার ধারণা আছে, তবু এটা তাত্ত্বিক ও গাণিতিকভাবে ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ

(30 top problems with Big Bang: Tom Van Flandern)। ক্রমশ এ তত্ত্বের বিভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্যতা স্পষ্ট হতে থাকে এবং বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার তথ্য এ তত্ত্বের সাথে অসংগতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় এবং বিজ্ঞানীরা পুনরায় চিরন্তন বিশ্বের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। মুসলিম মুতাকাল্লিমগণ ইতোমধ্যে যৌক্তিক ও গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছেন, পদার্থিক বিশ্বে প্রকৃত শূন্যতা যেমন অসম্ভব তেমনি প্রকৃত অসীমতাও তেমনি অসম্ভব এবং একই কারণে বিশ্বের অস্তিত্বের চিরন্তনতাও অসম্ভব। কিন্তু গণিতবিদেরা মুতাকাল্লিমদের কথায় কর্ণপাত না করে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভে শূন্যতা ও অসীমতাকে গাণিতিক প্রতীকে চিহ্নিত করে গণিতবিদ্যায় সংযোগ করেন। শূন্যতা ও অসীমতা অর্থগতভাবে পদার্থিক বিশ্বে অস্তিত্বহীন তাই অপরিমাপণযোগ্য কিন্তু গণিতবিদেরা এদেরকে পরিমাপণযোগ্য বিবেচনা করে গাণিতিক সমীকরণ উদ্ভাবন করেন। এসব সমীকরণ ধীরে ধীরে পদার্থ বিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ করে এবং বিজ্ঞানের হিসাব নিকাশকে কলুষিত করে। শূন্যতা ও অসীমতা এ দু'টোই এখন বিজ্ঞানীরা যথেষ্টভাবে ব্যবহার করছেন এবং হিসাবের বিভিন্ন রকম হেত্বাভাস ও প্যারাডক্সের জন্ম দিচ্ছেন। বস্তুত শূন্যতার অস্তিত্বের স্বীকৃতির মানেই হলো তার অসীম ব্যাপ্তিতার স্বীকৃতি যা তৌহিদ বিজ্ঞানের পরিপন্থি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যৌবনের উন্মাদনায় চরম নাটকীয়তায় আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে ইথারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বিশ্ববাসীর বীরপূজার সুউচ্চ শিখরে পৌঁছেন এবং ইথারের অস্তিত্বহীনতাকে বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে জনপ্রিয় করে তোলেন। বস্তুত ইথার বা শক্তিময় সত্তার অস্বীকৃতি হলো শূন্যস্থানের অস্তিত্বের স্বীকৃতি যা দার্শনিক ও ধার্মিকভাবে অসম্ভব। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির একটু স্থিরতা আসলে এক যুগ পর ইথারের অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য হন এবং বলেন, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব মতে ইথারের অস্তিত্ব ছাড়া আলোর গতি অসম্ভব। কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্টতা মুক্ত না হতে পেরে ঘোষণা দিলেন ভারী পদার্থ অর্থাৎ সূর্য বা নক্ষত্রের উপস্থিতিতে স্থান বক্র হয়ে যায় এবং স্থানের বক্রতা দিয়ে মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন এবং জীবনের শেষপ্রান্তে আপেক্ষিক তত্ত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিজের পরাজয় ও ব্যর্থতা স্বীকার করে বললেন," পদার্থ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারণাগত মূল ভিত্তি এখনো নির্ভরযোগ্য নয় এবং প্রকৃতির মৌলিক সত্যতা থেকে এখনো অনেক দূরে"। বস্তুত শক্তিময় স্থানিক কাঠামো বা ইথারের বা কোনো না কোনো প্রকার শক্তির উপস্থিতি ছাড়া দূরে অবস্থিত বস্তুর উপর অন্যবস্তু বা শক্তির কার্যকারিতার (Action at a distance) ব্যাখ্যা দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব যা হাজার বছর আগে থেকে জেনোর প্যারাডক্স নামে পরিচিত। আর পদার্থ বিজ্ঞান কেবল

পদার্থিক বৈশিষ্ট্যের আচরণগত কার্য-কারণের নিয়মাবলি সনাক্ত করতে পারে মাত্র, পদার্থ সৃষ্টির বিষয়টি তার গবেষণার ক্ষেত্রের সীমার বহির্ভূত কারণ পদার্থের আচরণের বৈশিষ্ট্যগত নিয়মাবলি পদার্থ পূর্ব ক্ষেত্রের পদার্থ সৃষ্টির নিয়ামক হতে পারে না।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ কালিন প্রাকৃতিক দর্শনের আলোচনায় বিভিন্ন জ্ঞানী গুণীজন তাদের বক্তব্যের মাঝে স্রষ্টা বা ঈশ্বর সমন্ধে নানা মন্তব্য পেশ করতেন, যেমন আমরা দেখতে পাই নিউটনে প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকাতে। কিন্তু প্রাকৃতিক দর্শন থেকে বিজ্ঞান বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে বিকষিত হয়ে জ্ঞানের একটি স্বাধীন শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতেই আমরা দেখতে পেলাম বিজ্ঞান থেকে স্রষ্টাকে নির্বাসন দেয় হয়েছে এবং বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থে স্রষ্টা বা ঈশ্বর সমন্ধে কোনো বক্তব্য নেই এবং বিজ্ঞানের অলিখিত মূলনীতি হলো তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে স্রষ্টার বিষয়ে কোনো বক্তব্য দেয়া চলবে না এবং প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে স্রষ্টার বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে হবে। স্রষ্টার স্বীকৃতি দেয়া যেন তাদের পাণ্ডিত্যের পরাজয় মেনে নেয়া। তাই বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করছেন স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টিকে তারা শুধু পদার্থিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কিন্তু ব্যাখ্যা করতে না পারার ব্যর্থতা তাদেরকে পীড়া দিচ্ছে এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানী শেষ বয়সে নিজ বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছেন না।

প্রাকৃতিক দর্শন যতটা তীক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলো তার উদর থেকে উদ্ভূত বিজ্ঞান হলো ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন এবং ভাবছে সে যেটুকু দেখতে পায় সেটাই হলো সম্পূর্ণ বিশ্ব, তার দৃষ্টির বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, যা তার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, তার অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়। বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন ও ধর্ম যেহেতু বর্তমানে জ্ঞানের পৃথক পৃথক শাখা এবং একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখছে এবং কেউ কাউকে সহ্য করছে না, ফলে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সত্য অন্বেষণ আর হয়ে উঠছে না। প্রকৃত সত্য অন্বেষণ বর্তমানে কঠিন হয়ে উঠেছে কারণ বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিজ ক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যতা একটি সীমিত ক্ষেত্রে কিছু কারিগরি দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হলেও বিশ্বজাগতিকভাবে তা স্থান কালের উর্ধ্বে সত্য হতে পারে না।

বিগত তিন হাজার বছরের ভূমধ্যসাগরের এপারের ওপারের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থবিহীন গ্রীক-রোমান সভ্যতার সাথে উর্বরচন্দ্রিকা অঞ্চলের (Furtile cresent) ধর্মীয় বাণীপূর্ণ পারস্য-ব্যাবিলনীয়-মিসরীয় সভ্যতার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এ পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব নিরসনে প্রথমে

ইহুদী ধর্মগ্রন্থ পরে খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ গ্রীক-রোমান দর্শন ও বিজ্ঞানকে ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ পরিপূর্ণ না হওয়ায় এ শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি। এরপর পৃথিবীতে আসে সমস্ত সত্য মিথ্যা যাচাই করার মানদন্দ হিসেবে ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার দাবী নিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এটার শুদ্ধি অভিযান শুধু দর্শন- বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইহুদী ও খ্রিস্টধর্মসহ সব ধর্মীয় জ্ঞানসহ মানব অর্জিত যাবতীয় জ্ঞান এটার শুদ্ধি অভিযানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে একটি বিশ্ব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে যার নাম ইসলামী সভ্যতা। এ সভ্যতায় প্রাচীন সব সভ্যতার সব অর্জিত জ্ঞান, প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন ঘটে এবং ইহুদী, খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের জ্ঞানী গুণীজন এ সভ্যতার বিকাশে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ্বের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের মহাঐক্য সংঘটিত হয়েছিল। সে যুগের এমন কোনো দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নেই যেখানে ধর্মীয় বাণী অন্তর্ভুক্ত না আছে এবং ধর্মীয় বিষয়ে এমন গ্রন্থ কম যেখানে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্তি না ছিলো।

কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে ইসলামী সভ্যতা নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে মহাঐক্যভূত জ্ঞানে বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় জ্ঞান পরস্পর পৃথক হয়ে পড়ে। ইসলামী সভ্যতার দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে ইউরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে জাগরণ শুরু হয় তা এ বিভাজন প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারেনি বরং আপন ঐতিহ্যের মোহে এটাকে আরো ত্বরান্বিত করেছে এবং বর্তমান বিশ্বের সার্বিক জ্ঞানবিজ্ঞানের খণ্ডিত বিখণ্ডিত অবস্থা হলো তার ভয়াবহ পরিণতি। এটা এমন পর্যায় পৌঁছে গেছে যে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কিনা তা তার নিজেরই জানা নেই। কারিগরী দক্ষতায় বেশী শক্তিশালী হয়ে বিজ্ঞান এখন দার্শনিক ও ধর্মীয় জ্ঞানকে কটাক্ষ ও উপেক্ষা করছে কিন্তু নিজ জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারছে না। বিজ্ঞানের প্রতিটি সূত্র বাস্তব জগতের প্রাকৃতিক কার্যক্রমের মানবীয় বোধগম্যতার সহায়ক মডেল মাত্র, কিন্তু তারা নিজগুণে সত্য নয়।

বর্তমানে অধিকাংশ প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী (Grounded in knowledge) স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে স্থান ব্যতিত পদার্থ সৃষ্টি ও ধারণ অসম্ভব এবং স্থানই হলো পদার্থিক সমস্ত শক্তির উৎস। এ কারণে অনেক জ্ঞানী বিজ্ঞানী পদার্থ চিরন্তন না হলেও স্থানকে চিরন্তন ভাবছেন। স্থানে চিরন্তনতা আরোপ করার কারণেই তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের গাণিতিক কাঠামোতে সম্প্রসারণশীল, স্পন্দনশীল (Oscillatory) কিংবা সমান্তরাল (Parallel) বিশ্বের চিত্র ফুটে উঠছে এবং বিজ্ঞানীদের হাতে স্থানের বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে অসৃষ্ট ও চিরন্তন সত্তা হিসেবে।

তাদের মতে বিশ্বে অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য কোনো একটা চিরন্তন সত্তা প্রয়োজন হয় স্রষ্টা কিংবা শক্তিময় স্থান এবং চিরন্তনের বৈশিষ্ট্য স্রষ্টায় আরোপ না করে সরাসরি স্থানে আরোপ করলে অসুবিধা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে স্থানকে তিনি সৃষ্টি করেছেন অতি প্রাকৃতিক তরল বৈশিষ্ট্যময় সত্তা থেকে এবং সেই স্থানকে পূর্ণ করেছেন তার জ্যোতি দিয়ে। এই জ্যোতিকে তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছেন উপমিত জয়তুন বৃক্ষের তৈল সদৃস্য সত্তা থেকে এবং এ সত্তা এমন যে তা অগ্নি স্পর্শ না করলেও জ্যোতি বিকিরণ করে। অর্থাৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কোনো কিছুর সাথে আল্লাহ তায়ালার মূল গুণাবলি বা সিফাতের পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কের ভুল বুঝাবুঝির কারণে অনেক ধার্মিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী বিশ্বজগতকে সৃষ্টিকর্তার একটি অংশ মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে সর্বেশ্বর (Pantheism) ধারণায় বিশ্বাসী হয়েছেন। তাছাড়া শুধু স্থান থেকে পদার্থ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এটার উত্তর পাওয়া সম্ভব নয় যে মহাবিশ্ব কেন অস্তিত্ব লাভের ঝামেলা পোহাতে গেল? এটার উত্তর কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সত্তার অস্তিত্ব ও উপস্থিতির স্বীকৃতিতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

বিশ্ব সৃষ্টি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার আরশ ছিলো স্থান ও কালের আদিম উপাদান অতি প্রাকৃতিক তরল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সত্তার উপরিভাগে এবং বিশ্ব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট উপস্থিতি ও নির্দেশের প্রয়োজন ছিলো মাত্র। তার শক্তির কোনো অংশ বিশ্বের আদি উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন ছিলো না, যার উপমিত ভাষা হলো সৃষ্টি মুহূর্তে আল্লাহর আরশ ছিলো পানির উপর। আর স্থান ততক্ষণ শক্তিপূর্ণ ও অস্তিত্বশীল থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা প্রদীপ জ্বালিয়ে তা জ্যোতিপূর্ণ রাখবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা উপমিত ভাষায় বর্ণিত প্রদীপ জ্বালানো বন্ধ করে দিলে কিংবা তার নূরের প্রবাহ বন্ধ করে দিলে স্থানিক কাঠামো শক্তি বঞ্চিত হবে এবং স্থান অস্তিত্বহীন হবে। এটাকে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যায় ইথারবিহীন অবস্থা। আর ইথারবিহীন অবস্থায় আলোর গতি অসম্ভব। যখন আলোর গতি অসম্ভব হবে তখন সমস্ত যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙ্গে যাবে এবং তাপ গতি বিদ্যার সব সূত্র অকার্যকর হবে এবং বিজ্ঞানীদের বহুল ব্যবহৃত এনট্রপি বলে কিছু থাকবে না। এমতাবস্থায় সব মৌল পদার্থের পারমাণবিক বন্ধন ভেঙ্গে যাবে এবং কোনো মৌল পদার্থের অস্তিত্ব থাকবে না, এমনকি ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনসহ সব পরমাণবিক কি অতি পরমাণুবিক কণার অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে অর্থাৎ পদার্থিক বিশ্ব অস্তিত্বহীন হবে। বস্তুত স্থান অস্তিত্বহীন হলে পদার্থ অপরিহার্যভাবেই অস্তিত্বহীন হবে। এটা হলো নিখিল বিশ্ব পরিচালনার কার্যপদ্ধতি (Niversal mechanism)। তাই বিশ্বের প্রারম্ভিকতার প্রশ্নে বিগব্যাংগ

তত্ত্বের স্থান-কালের অনন্য বিন্দু যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বরং স্থানের অস্তিত্ব লাভের প্রারম্ভিকতাই হবে বিশ্বজগতের প্রারম্ভিকতা।

জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি শিরোনামের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বিশ্বজগতের স্থানিক কাঠামোতে সংযুক্ত শক্তি যাকে বলা হয় আল্লাহর নূর যা আবার প্রচণ্ডবেগে গতিশীল এবং যে সীমা পর্যন্ত এটা বর্ধিত সেটাই হলো বিশ্বজগতের প্রান্তিক অঞ্চল। এটাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় সিদরাতুল মুনতাহা। এটা হলো পার্থিব বিশ্বজগতের অস্তিত্বশীলতার জন্য আল্লাহর সৃজনশীল নূরের প্রবাহের শেষ সীমা এবং পার্থিব ও অপার্থিব জগতের সীমারেখা। তাই এটার পর স্থানের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই আমাদের প্রচলিত ধারণাগত কালও নেই এবং তাই গতি অসম্ভব। গতি অসম্ভবের কারণে তা অতিক্রম করাও অসম্ভব। স্থানের মূল প্রকৃতি সমন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় অনেক বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের সীমা ও স্থায়িত্ব নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি।

বিশ্ব তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জন্য আমরা যে পথ নির্ধারণ করে বর্ণনা করলাম তা থেকে আপাতত গাণিতিক পরিমাপণ বর্ণনা থেকে আমরা বিরত থাকব কারণ গাণিতিক হিসাবের দূরকল্পন পদার্থিক বিশ্বকে যেভাবে গ্রাস করেছে সেখান থেকে বিশ্বজগৎ সমন্ধে সঠিক পরিমাপণ সম্ভব নয়। কারণ গণিত একটি প্রতীকি ভাষা মাত্র এবং এ ভাষায় সত্য মিথ্যা দু'টোই সমানভাবে বর্ণনা করা যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্য প্রবাহে হিসাবের প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য গণিতের হিসাবের সামান্য ভুলত্রুটি হলেও তা গ্রহণযোগ্য কিন্তু সার্বিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে গাণিতিক পরিমাপ সত্যনিষ্ঠ থাকে না কারণ বিশ্বের সব স্থিতিমাপক (Parameter) এখনো বিজ্ঞানের জন্য সুনির্ধারিত হয়নি। এখনো বিশ্বের সীমা পরিসীমা ও স্থায়িত্বের ব্যাপ্তি নির্ধারিত হয়নি কিন্তু গাণিতিক দূরকল্পনার বাহুল্যতা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন এমন পর্যায় পৌঁছে গেছে যে তাদের গণিতের সমীকরণে অসংখ্য সমান্তরাল কিংবা স্পন্দনশীল বিশ্বের অপচ্ছায়া ফুটে উঠছে এবং বর্তমান জগতকে অতিক্রম করে অন্যজগতে যাবার স্বপ্নেবিভোর। বিজ্ঞানীরা তত্ত্বের বোঝা ভারে প্রকৃত সত্য থেকে এত দূরে চলে গেছে এবং তত্ত্বের ঝুলি এত জটিল ও বিকৃত (Crooked way) হয়ে গেছে যে তারা নিজেরাই পরিত্রাণের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। বিজ্ঞানীদের পরিত্রাণের একটি পথের ভিত্তি আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম যার নাম সহজ সরল পথ- 'সিরাতাল মুস্তাকিম' (Straight path)- তাদেরকে এ পথে প্রত্যাবর্তন করতে হবে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করতে হলে। বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি নিষেধের তর্ক-বিতর্কের পাশ কাটিয়ে আজ হোক কাল হোক, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিতসহ জ্ঞানার্জনের সব শাখা প্রশাখাকে এ পথে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং এটা যত দ্রুত হবে বিশ্ববাসীর জন্য তত মঙ্গল।

উপসংহার

বিশ্বজাগতিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কিছু কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি এবং দেখেছি বিজ্ঞানের কোনো সূত্রাবলিই বিশ্বজনীনভাবে সত্য নয়, এমনকি সত্য হওয়া সম্ভবও নয়। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব আঞ্চলিকভাবে মানবজাতির ব্যবহারিক উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সেগুলোকে চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিক বৈধতা নেই। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের তিনশত বছরের ইতিহাস ও রসায়ন বিজ্ঞানের দুইশত বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় নিউটনের গতি ও মহাকর্ষ সূত্র, ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রোডিনামিক্সের সূত্র, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক ও নিলস বোরের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, রসায়ন বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক শক্তির ইলেকট্রন ভিত্তিক আণবিক বন্ধনের সূত্র কোনোটাই প্রকৃত সত্যকে উপস্থাপন করে না বরং নতুন নতুন তত্ত্বের পর তত্ত্বের ভারে সত্যকে আড়াল করছে।

পদার্থ বিজ্ঞানের অপূর্ণাঙ্গ সূত্রাবলি প্রভাব বিস্তার করেছে রসায়নে এবং এর ফলে কলুষিত রসায়নের বিভিন্ন তত্ত্ব অনুপ্রবেশ করেছে জীববিজ্ঞানে এবং সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখায়। এসবের সংমিশ্রণে যে বৈজ্ঞানিক দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে তাতে বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নাস্তিকতার বিভীষিকা আঘাত হেনেছে এবং যারা এ নাস্তিকতার ছোবল থেকে রক্ষা পেয়েছে তাদের চৈতন্যবোধ এমন হয়েছে যে তারা যে প্রকারে যে উৎসবের মাধ্যমে ঈশ্বর পূজা করে তুষ্টি লাভ করে তাতেই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং এ ব্যাপারে ঈশ্বরের কোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে কোনো পরীক্ষায় বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সেখান থেকে মাত্র দু'একটিকে বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন এবং অধিকাংশকে দৃষ্টির অগোচরে রাখেন কিংবা অস্বীকার করে একাট ঈপ্সিত তথ্য ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নিউটনীয় মহাকর্ষ তত্ত্বে কেবল গ্রহ নক্ষত্রের ভরের সাথে দূরত্বের সম্পর্ক বিবেচনায় আনা হয়েছে, অথচ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত সূর্য ও পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র কিংবা বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় আকর্ষণ বিকর্ষণ বিবেচনায় আনা হয়নি। একইভাবে পরমাণু জগতে ইলেকট্রন প্রোটনের কেবল বৈদ্যুতিক আধানের কথা বিবেচনায় আনা হয়েছে, চৌম্বকীয় শক্তিকে বিবেচনায় আনা হয়নি।

বাস্তব পদার্থিক জগতের ক্ষেত্র হলো বহুমুখী বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানের গবেষণায় কেবল দু'একটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে একটি কল্পিত ক্ষেত্রের গাণিতিক সমাধান হলো বৈজ্ঞানিক সূত্র। ফলে অধিকাংশ বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখার ভিত্তিই হলো কল্পিত ভিত্তির উপর স্থাপিত, যেমন বিগ ব্যাংগ বিশ্ব তত্ত্ব , প্রোটন কেন্দ্রীক ইলেকট্রনের আবর্তন ভিত্তিক পরমাণুবাদ। এরকম কয়েকটি কল্পিত ভিত্তির উপর স্থাপিত তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত হলো বৈজ্ঞানিক বিশ্ব তত্ত্ব- বিভাসদের ভাষায়- Universe fraud : Mother of all fraud.

এটা শুরু হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে এবং জ্ঞানরাজ্যে জ্ঞান ভাইরাস হিসেবে মানবীয় অর্জিত জ্ঞানকে কলুষিত করেছে। এটার মূল কারণ হলো স্থান সম্বন্ধে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বিভ্রান্তি, ক্ষেত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অস্পষ্টতা, শূন্য ও অসীম সম্বন্ধে গাণিতিক জটিলতা, বিন্দু সম্বন্ধে জ্যামিতিক বিভ্রান্তি। এসবের সাথে সংযোগ ঘটেছে বিভাজিত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন কক্ষে বন্দী আপাত দৃশ্যমান ক্ষুদ্র বিভক্ত সত্য এবং তা সংরক্ষণকারী পেশাজীবি এবং নিজ ক্ষেত্রের স্বল্প মূল্যের জীবিকায় তৃপ্ত স্বঘোষিত আলোকপ্রাপ্ত আলোক বিতরণকারী। কারণ পেশাজীবিতার অর্থনৈতিক মূল্যের বাইরের উদ্বৃত্ত সময়ে চিত্তরঞ্জনের গুরুত্ব সত্য অন্বেষণের চেয়ে বেশী। বস্তুত বর্তমান জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ সত্যের সাথে সম্পর্কবিহীন, শুধু অর্থনৈতিক মূল্যের সুবর্ণ মোড়কে আবৃত একটি বাণিজ্যিক ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিভিন্ন মাত্রার বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

হাজার বছর আগে ইমাম গায্যালী চিরন্তন বিশ্বে বিশ্বাসী দার্শনিকদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং বর্তমান সময়ে চিরন্তন বিশ্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের আমরাও নির্দ্বিধায় কাফির বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কাফির শব্দের অর্থ সত্য গোপনকারী এবং বিজ্ঞানীরা কিভাবে সত্য গোপন করছেন বা আড়াল করছেন তার কিছু কিছু দিক আমরা বিশ্লেষণ করেছি। সত্যকে গোপন করে সত্যের যে দৃশ্যমান মডেল তারা তৈরী করেছেন সেকারণেই বিজ্ঞান হয়ে পড়েছে নাস্তিকতার আবাসস্থল। বিশুদ্ধ চিন্তার দাবী নিয়ে গণিতবিদেরা প্রথমে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন পদার্থ বিজ্ঞানে এবং গাণিতিক সত্যতার দাপট দেখাতে পদার্থের হিসাব নিকাশকে কলুষিত করে প্রচলিত নিয়মাবলির সীমা লঙ্ঘন করে নিজেদের স্বাধীন করে যোগ দিয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের প্রাচীর ভেঙ্গে তাদের কল্পনাবিলাস ধাবিত হচ্ছে বিশ্বজগতের প্রান্তিক অঞ্চলের উন্মুক্ত অসীমে এবং অসীম সংখ্যক সমান্তরাল কিংবা স্পন্দনশীল বিশ্বে কোয়ান্টাম অমরত্বের মাধ্যমে নিজেদের অসংখ্য প্রতিরূপের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন। আজ

এবং আগামীকালটি কেমন যাবে সে ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য প্রদানে ব্যর্থ হয়ে সে ভবিষ্যৎ বাণীর দায়িত্ব জ্যোতিষীবিদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা দায়িত্ব নিয়েছেন বিলিয়ন কিংবা ট্রিলিয়ন বছর পর বিশ্বে অবস্থা কি হবে এবং কত বিলিয়ন বছর আগে বিশ্ব আলপিনের মাথায় ঝুলছিল তা নিয়ে তত্ত্বকথার বোঝা ভারী করতে।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবীয় অর্জিত আরোহী জ্ঞান বিশেষত অধিবিদ্যাগত জ্ঞান হলো পদার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক এবং একবিংশ শতাব্দীতেও পদার্থ বিজ্ঞান স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এখনো অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত সত্যেও নিকটবর্তী দূরকল্পনের একটি মডেল মাত্র। রসায়ন, জীববিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা হলো পদার্থ বিজ্ঞানের নানাবিধ বিচ্যুতি। ফলে অধিবিদ্যা ও দর্শন একই কারণে অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান মানুষের ধর্মীয় চৈতন্যবোধের তৃষ্ণা মিটাতে কখনো সক্ষম ছিলো না এখনো নেই। তাই ধর্মগ্রন্থের বাণীকে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক তত্ত্বকথা দ্বারা প্রতিস্থাপনের চেষ্টা হলো প্রকৃত সত্যকে গোপন বা আড়াল করার চেষ্টা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সূত্র ব্যবহার করে কারিগরি উৎকর্ষতা অর্জন ও মানবীয় আর্থসামাজিক উপযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও তাকে বিশ্বজাগতিকভাবে ব্যবহার করা হলো সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। আমরা যদি ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস আর বৈজ্ঞানিক অন্ধবিশ্বাসের তালিকা প্রস্তুত করি তবে দেখা যাবে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে বৈজ্ঞানিক অন্ধবিশ্বাসের তালিকা দীর্ঘ। একারণে আধুনিক বিজ্ঞান হচ্ছে প্রাচীন প্রতীমাদের দৈহিক অবয়বকে বৈজ্ঞানিক গাণিতিক প্রতীকের রূপান্তর এবং প্রতীমাদের বংশবৃদ্ধির উর্বর ক্ষেত্র মাত্র। আমরা সবধরনের প্রতীমা পূজার বিরোধী।

বিজ্ঞান নির্ভর জ্ঞান ও অধিবিদ্যার অপূর্ণাঙ্গতার বাস্তব পরিণতি হলো এটা যে প্রাচীনকালের ধর্মবিরোধিরা (কাফির) দাবী করত, "স্বয়ং ঈশ্বর যদি আকাশ থেকে নেমে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন তবে আমরা বিশ্বাসী হব" এবং বর্তমান ধর্মহীনরা আরো একধাপ এগিয়ে দাবী করছেন," আমাদের সম্মুখে শুধু ঈশ্বর উপস্থিত হলেই চলবে না বরং তার দৈহিক কাঠামো থেকে একটি অংশ আমাদের হাতে দিতে হবে যেন আমাদের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করতে পারেন তিনি কি কি উপাদানে গঠিত"।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সব ধরনের প্রতীমার সত্য আড়াল ও সত্য গোপন করার প্রচেষ্টাকে উন্মোচন করার শক্তি দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র :

1. Prolegomena to any future physics based metaphysics – Bradly Monton
2. On the inherent incompleteness of scientific theory - Jolly Mathen
3. Models and fiction -Raman Frigg
4. Astronomical Blunders : Cosmology and Big Bang -Robert P. Lanigan
5. Practical Certainty and Cosmological Conjvectures - Nicolas Maxwell
6. Model and theory of D.N.A. –Samuel Schindler
7. Devil in the details - Batterman
8. Causation as Folk science - John D. Norton

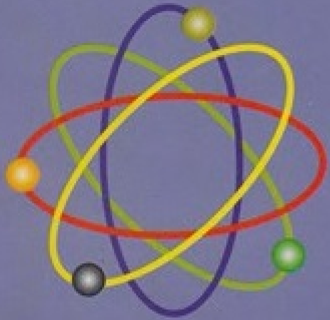

RAQS Publications

RAQS PUBLICATIONS

ISBN 984-300-002344-7